অবিশ্বাসী ও দুনিয়াদার সমাজে

ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠার রূপরেখা

এবং

গাজওয়াতুল হিন্দ

আব্দুল ওয়ারিথ বিন আবদ আল মুঘনী



সূচিপত্র

বইটি লেখার পটভূমি

পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহ এর নামে শুরু করছি। বাংলাদেশে ইসলামী শরিয়া আইন কায়েম করার কথা বলে এমন দলের সংখ্যা কম নয়। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তারা যে শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার কোন রূপরেখা তারা দেয় না। যেমনঃ তারা যদি জয়ী হয় তাহলে, তারা শরিয়ার কোন কোন আইন বাস্তবায়ন করবে? কিভাবে করবে? চোরের হাত কাটবে? ব্যভিচারের জন্য পাথর নিক্ষেপে হত্যা করবে? এই দেশের মানুষ শরিয়া কি তাই জানে না এই সুযোগে কিছু লোক শরিয়ার নামে বিভিন্ন ফিকহের ভুল ব্যাখ্যা শরিয়া নামে চালিয়ে দেয়। দীর্ঘদিন ধরেই চিন্তা করছিলাম যে, কিভাবে বাংলা অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যায়, ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা যায়। শেষ পর্যন্ত হাদিসে কিছু দিক-নির্দেশনা পেলাম তাই, এই বইটি লিখলাম। বইটি বাংলা অঞ্চলে বা যে এলাকায় অবিশ্বাসী ও দুনিয়াদার মানুষের সংখ্যা বেশি সে অঞ্চলের লোকদের মাঝে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগতে পারে। বইটি কেবল একটি রূপ রেখা, চূড়ান্ত কিছু নয়। **আমি মনে করি, আপনি সারা জীবনে যে কোন আলেমের যত বই পড়ে ইসলাম সম্পর্কে যত কিছু জেনেছেন তার চেয়ে বেশি জানতে পারবেন ১৪১ পৃষ্ঠার এই একটি বই পড়ে।**

এই বইটি যে কোন মুসলিম পড়লে অবাক হবেন এটা জেনে যে, ইসলামী শরিয়া আইন সম্পর্কে এত দিন কি জানতাম - আর ইসলামী শরিয়া আইন আসলে কি? যে কোন মুসলিম বইটি পড়লে ইসলাম কি? শরিয়া কি? ফিকহ কি? শরিয়ার সাথে ফিকহের পার্থক্য কি? মুমিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কি? ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় জানতে পারবেন। বিশেষ করে আপুদের এই বইটি পড়া উচিত।

গাজওয়াতুল হিন্দ বহু আগে শুরু হয়ে এখন শেষ পর্যায়ে আছে। ইসাঃ আঃ আসার আর বেশিদিন বাকি নেই।

যারা বাংলা অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন তাদের এই বইটি পড়া উচিত। এটি হয়তো আমার লেখা সর্বশেষ বই কারণ আমার আর বই লেখার ইচ্ছা নেই। **এই বইটি আমার লিখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই।** এটি বইটির প্রথম সংস্করণ।

*** একটু কষ্ট করে হলেও বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বেন। ইসলাম বুঝার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য বইটি অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন।

*** বইটি সম্পূর্ণ কপি রাইট মুক্ত অর্থাৎ Copy Right Free / Public Domain / public Property. যে কেউ চাইলে বইটি সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে প্রকাশ করতে পারবেন। বইটির ২ টি অংশ একটি হলঃ "অবিশ্বাসী, দুনিয়াদার সমাজে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠার রূপ রেখা" অপর অংশটি হল "গাজওয়াতুল হিন্দ"। যে কেউ চাইলে ২ টি অংশকে আলাদা আলাদা করেও বই প্রকাশ করতে পারবেন।

*** বইটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য যদি কেউ নিজের বইয়ে ব্যাবহার করতে চান তাহলে অবশ্যই রেফারেন্সে এই বইটির নাম, লেখকের নাম এবং পৃষ্ঠা নাম্বার উল্লেখ করবেন। অন্যের কাজকে যারা নিজের নামে চালিয়ে দিয়ে সুনাম এবং টাকা উপার্জন করতে চান তাদের ফয়সালা আল্লাহ এর হাতে।

ইসলাম প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার নিয়ম

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয ইবন জাবালকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বললেন। "আপনি কিতাবধারীদের সংস্পর্শে আসবেন, এবং যখন আপনি তাদের কাছে পৌঁছাবেন, তখন তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত দূত। এবং যদি তারা তাতে আপনাকে মেনে নেয়, তবে তাদের বলুন যে আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। এবং যদি তারা এতে আপনাকে মেনে নেয় তবে তাদের বলুন যে আল্লাহ তাদের উপর সদকা (যাকাত) প্রদান ফরয করেছেন যা তাদের মধ্যে ধনীদের কাছ থেকে গ্রহন করে তাদের মধ্যকার দরিদ্রদের মধ্যে প্রদান করা হবে ; এবং যদি তারা এতে আপনাকে মেনে নেয়, তবে তাদের সর্বোত্তম সম্পত্তি (যাকাত হিসাবে) গ্রহণ করবেন না এবং নির্যাতিত ব্যক্তির অভিশাপকে ভয় করুন কারণ তার দোয়া এবং আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে নেই। (সাহিহ বুখারী ৪৩৪৭)

হাদিসটি থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, কোন জায়গায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করতে হলে সবার প্রথমে সেই জায়গার মানুষকে বুঝতে হবে, তাদের বিশ্বাস, তাদের জীবন যাপনের পদ্ধতি, চিন্তা-ভাবনা, সংস্কৃতি, জীবিকা, অর্থনৈতিক অবস্থা, আর্থ- সামাজিক কাঠামো, ইত্যাদি বুঝতে হবে। তাদেরকে যদি বুঝতে না পারেন তাহলে সেই অঞ্চলে আপনার ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন – স্বপ্নই থেকে যাবে - তা কখনো বাস্তবে হবে না। অর্থাৎ কাজ শুরুর আগেই কাজ বিফল হয়ে যাবে। এজন্য কোন অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করার আগে সেই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস, জীবন যাপনের পদ্ধতি, সংস্কৃতি, তাদেরকে যেই সিস্টেমে শাসন করা হচ্ছে সেই সিস্টেমকে, চিন্তা-ভাবনা, ইত্যাদি বুঝতে হবে। এই ক্ষেত্রে যদি আপনি বা আপনার দল ভুল করেন অর্থাৎ সেই অঞ্চলের মানুষকে বুঝতে ভুল অ্যানালাইসিস (Analysis) করেন তাহলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ পিছিয়ে যাবে - এমন কি হয়তো আপনি বা আপনার দল ঐ অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কোন দিন -ই সফল হবেন না।

আল্লাহ এর রসূল সাঃ বেশি কথা বলতেন না। তিনি খুব অল্প কথায় গুরুত্বপূর্ণ কথা বা পথ নির্দেশ দিয়ে দিতেন। উনার ছোট একটি বাক্য বা বাক্যের অংশ থেকে অনেক বড় পথ নির্দেশ আসবে, উনার প্রতিটি শব্দ চয়নে, বাক্য গঠনে, বাঁচনশৈলীতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য থাকে যা আমরা বুঝতে পারিনি বা সেইভাবে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করিনি।

মুয়াজ ইবনে জাবাল রাঃ কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন, " আপনি কিতাবধারীদের সংস্পর্শে আসবেন," --- এই কথাটা তিনি প্রথমেই বলেছেন, কেন? এই কথাটা কেন বলেছেন চিন্তা করেছি কি আমরা ? এই কথার মধ্যে মুয়াজ বিন জাবালসহ পৃথিবীর সকল মুসলিম - যারা কোন ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাজ করবেন তাদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশনা মুহাম্মাদ সাঃ দিয়েছেন যে, যেই ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন সেই ভূখণ্ডের মানুষের সম্পর্কে জানুন, তাদের চিন্তা ভাবনা ও বিশ্বাসকে বুঝুন, তাদের বর্তমান শাসন ব্যবস্থা বুঝুন, সংস্কৃতি বুঝুন, তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন দল সম্পর্কে জানুন, তাদের আইন কানুন সম্পর্কে জানুন, ইত্যাদি। বাংলাদেশে এই বিষয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেছে এমন কোন 'ইসলামী দল' আমার জানা মতে নেই। এখন অনেক দলের সদস্যই বলবেন যে, আমরা করেছি কিন্তু যখন এই বইটি পড়া শেষ করবেন তখন বুঝতে পারবেন যে আপনি বা আপনার দল এই ধরণের কোন চিন্তা-ভাবনা করেন নি।

সুতরাং, আমাদেরকে এই দেশে "ইসলাম প্রতিষ্ঠা" শব্দ ২ টি উচ্চারণের আগে এই দেশের মানুষ সম্পর্কে জানতে হবে, তাদের ব্যাপারে বড় পরিসরে গবেষণা করতে হবে যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ কবে শেষবার নিজেদেরকে নিজেরা শাসন করেছে তা বলা দুষ্কর। ইংরেজরা ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই দেশের মানুষকে শাসন করেছে, তারপর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্থান শাসন করেছে তারপর ১৯৭১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত এদেরকে কে যে শাসন করেছে বলা মুশকিল। এই অঞ্চলের মানুষকে ইংরেজরা শাসন করার আগে ২০০ বছর শাসন করেছে মুঘলরা অর্থাৎ মঙ্গোলরা। অর্থাৎ বিগত ৫০০-৬০০ বছর ধরে শাসিত হতে হতে এই অঞ্চলের মানুষ জাতিগতভাবে মেরুদণ্ডহীন জাতিতে পরিণত হয়েছে। এরা তিনবেলা খাবে, টাকা জমাবে, আনন্দ ফুর্তি করবে আর শাসক দলের পা চাটবে অর্থাৎ যখন যেই দল সরকারে আসবে সেই দলের পা চাটা শুরু করবে। এভাবে সম্মানহীনভাবে অন্যের পা চেটে এরা বেচে থাকবে শুধু তিন বেলা খেয়ে পড়ে বেচে থাকার জন্য। এদের আত্মসম্মানবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। রাস্তা- ঘাটে বা বাসা বাড়িতে কেউ ছিনতাই করলে বা চাঁদা চাইলে কেউই একজন অন্য জনের পক্ষে এগিয়ে আসে না। সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা এদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে গেছে। এরা এখন দাজ্জাল দ্বারা শাসিত হচ্ছে। দাজ্জাল এদের সাথে প্রতারনা করছে। দাজ্জাল সরকার - পুলিশ, র‍্যাবকে বলছে অমুককে গুম করো, হত্যা করো তারপর তারা তা করলে পরে আরেক দাজ্জাল সরকারে এসে তাদেরকে বলছে যে, তোমরা এই কাজ করেছ কেন? এখন তোমরা জেলে যাবে, তোমাদের শাস্তি হবে অথচ আগের দাজ্জাল কিন্তু

তাদেরকে ভয় দেখিয়ে গুমের কাজ করিয়েছে যে, গুম না করলে, হত্যা না করলে তোমার চাকরী থাকবে না, ইত্যাদি। দাজ্জাল এমন-ই। সে ধোঁকা দেয়। এক দাজ্জাল চলে যাবে, আরেক দাজ্জাল আসবে কিন্তু দাজ্জালের সিস্টেম থেকে যাবে, সেই সিস্টেমে আজ যে বন্ধু কাল সে শত্রু হয়ে যাবে।

বঙ্গ বা বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি ও আর্থ সামাজিক কাঠামোর একটি মূল্যায়নঃ

ক) এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে যা মোট জনসংখ্যার ৯০% হবে অর্থাৎ ১৮ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ১৬ কোটি ২০ লাখ লোক মুসলিম বলে নিজেদের দাবী করে । তাদের বেশিরভাগ লোক মাঝে মধ্যে সালাত পড়ে অর্থাৎ শুধু জুম্মার নামাজ পড়ে। রমজানে সওম রাখে, কিছু মেয়ে হিজাব করে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে এমন মুসলিমের সংখ্যা মোট মুসলিমের ৩% থেকে ৫% হতে পারে। অর্থাৎ ১৬ কোটি মুসলিমের মধ্যে মাত্র ৭০ লাখ থেকে ৮০ লাখ লোক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। এদের মধ্যে অধিকাংশই আবার বৃদ্ধ বা বয়স ৫০ এর বেশি। মুসলিম ১৬ কোটি ২০ লাখ লোকের মধ্যে ৮০% লোক সপ্তাহে ১ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমজানে রোজা রাখে, ঈদ করে, গরু কোরবানি করে ইসলামী সংস্কৃতির অংশ হিসেবে। ইসলামকে তারা সংস্কৃতি হিসেবে নিয়েছে। যেমনঃ শুক্রবারে জুম্মার নামাজ পড়া, রমজানে ১০-২০ টা রোজা রাখা, ইফতার মাহফিল, ঈদে নতুন জামা,গরু কোরবানি, চল্লিশা, চেহলাম, দুয়া মাহফিল, ইত্যাদি এই অঞ্চলের মুসলিমরা মুসলিম সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পালন করে। তারা ইসলামের অংশ হিসেবে এই কাজগুলি করে এই কথা বলার সুযোগ নেই। কারণ তারা যদি কারো কাছে বায়াত দিত বা অঙ্গীকার করত যে, আমরা শুধু শুক্রবারে জুম্মা পড়ব, রমজানে যা পারব রোজা (১০-১৫ টা) রাখব, ইত্যাদি আর তাদের নেতা যদি এই শর্তে তাদের বায়াত নিত তাহলে বলা যেত যে, তারা আংশিক ইসলাম মেনে নিয়েছে কিন্তু এদের কোন নেতা নেই যার কাছে এরা বায়াত দিয়েছে ফলে এখন এরা নিজের ইচ্ছামত সামাজিক ইসলাম বা বাপ - দাদার ইসলাম বা আলেমদের প্রচার করা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ইসলাম পালন করছে। এরা বিশ্বাস করে যে,ইমাম, আলেমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লেই জান্নাত পাবো বলে, সুতরাং আমি যদি দিনে ১-২ ওয়াক্ত বা সপ্তাহে ১ ওয়াক্ত নামাযও যদি পড়ি তাহলেও তো আগুনে পুড়ে-টুঁড়ে শেষ পর্যন্ত জান্নাতে যাবো - যেহেতু মুসলিম আছি ! এদের নারীরা হিজাব করে না। হিজাব করলেও সামাজিক কারণে করে, যেমনঃ সমাজের মানুষ ভালো বলবে, স্বামী - শাশুড়ি বলেছে তাই, ইত্যাদি। এই ভূখণ্ডের ৭০%-

৮০% মুসলিম এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী। এরা বিশ্বাস করে যে, যদি কেউ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে তাহলে, সে যথেষ্ট ইসলাম পালন করে ফেলেছে, জান্নাতে যাওয়ার জন্য আর কিছু করার দরকার নাই – যেহেতু ইমাম, আলেমরা ওয়াজে, বয়ানে বলে যে, নবী সাঃ বলেছেন যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লে জান্নাত পাওয়া যাবে। এই দেশে এই দলটি সবচেয়ে বড়, এরা স্কুল কলেজ, ভার্সিটি শিক্ষায় শিক্ষিত। এদের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেক লোক যদি ইসলামী শরিয়া আইন না চায় তাহলে এই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। তাই, আমাদের কর্মপরিকল্পনা এদেরকে ঘিরেই হবে, এদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া, পাওয়ার দিকে খেয়াল রেখে আগাতে হবে। এদের মধ্যে সমাজের জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত - মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত অংশের লোকেরা অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে হিজাব না পড়ার মনোভাব প্রবল, এরা ছেলেমেয়েদের ফ্রী মিক্সিং চায়, গান, বাজনা, খেলাধুলা চায়, ইত্যাদি। মেয়েরা লেখাপড়া করবে, চাকরী, ব্যবসা করবে - এরা তা চায়। বঙ্গ বা বাংলা অঞ্চলের এই শ্রেণীর নাম আমরা দিতে পারি "গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপ" (important group). এই দলের বা শ্রেণীর অন্তত অর্ধেক মানুষ যদি ইসলামী শরিয়া আইন না চায় তাহলে এই অঞ্চলে শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সরকার নির্ধারণে এরা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে, এদের থেকেই সেনাবাহিনী, প্রশাসনে লোকজন নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। এরাই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। ২০২৪ এ গণ-অভ্যুৎথান এদের নেতৃত্ব এবং প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহনে হয়েছে।

খ) বাংলা ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর আরেকটি অংশ আছে যারা ইসলামী শরিয়া আইন কায়েম করতে চায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এরা বিভিন্নভাবে একনিষ্ঠ মুসলিমদের বুঝায় বা বুঝিয়েছে যে ইসলামে গনতন্ত্র আছে বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাজ করা যাবে। যেমনঃ জামাতে ইসলামী, চরমোনাই পীর, খেলাফত মজলিস, ইত্যাদি। বাংলা অঞ্চলের মানুষ ইসলামী দল বলতে এই দলগুলোকেই বুঝে এবং ইসলামী রাজনীতি করতে হলে এই সকল দলের যে কোন একটিতে যোগ দেয়। সরকার গঠনে এদের ভূমিকা আছে কিন্তু এদের প্রভাব কম। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় এই দলগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গ) বঙ্গ অঞ্চলে প্রচুর পীর আছে, পীরের মুরিদ আছে। এদের অনুসারী বেশিরভাগ-ই হচ্ছে অশিক্ষিত, খেটে খাওয়া মানুষ যেমনঃ মিস্ত্রি, রিকশাওয়ালা, দোকানদার, ইত্যাদি। এরা ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আমাদের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী নয় কারণ সমাজে এদের প্রভাব কম। এদের মতামতের উপর ভিত্তি করে সরকার প্রতিষ্ঠা হয় না। সরকারে এদের তেমন কোন প্রভাবও নেই।

২) জীবিকাঃ এই অঞ্চলের বেশিরভাগ মানুষ হারাম – হালাম উপার্জনের ক্ষেত্রে তেমন একটা বাছ-বিচার করে না। দারিদ্রতা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা উভয়ই এখানে অতি প্রবল। ছেলেদের সাথে মেয়েরাও চাকরী,ব্যবসা করছে। কোন মেয়ে হয়তো প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য বা self recognition পাবার জন্য চাকরী, ব্যবসা করছে আবার কেউ হয়তো নিতান্ত বাধ্য হয়ে দু'বেলা ভাতের জন্য চাকরী করছে বা রাস্তায় বিরানি বিক্রি করছে।

৩) শাসন ব্যবস্থাঃ এই অঞ্চলে দাজ্জালের শাসন চলছে। দাজ্জাল নিজেকে মুসলিম দাবী করছে আবার শিরক, কুফরে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র দিয়ে সরকার পরিচালনা করছে। সমাজের আলেম, ওলামা তাদের শাসককে মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতিও দিয়ে দিয়েছে। সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারিদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ, ঘুষ ছাড়া কোন কাজ সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরা করে না। সরকার এমন আইন-কানুন করে রেখেছে যাতে সরকারী কর্মকর্তা - কর্মচারীরা ঘুষ খেতে পারে। দুর্নীতিতে সমাজ পরিপূর্ণ।

৪) বিচার ব্যবস্থাঃ বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে, ন্যয় বিচার থেকে দরিদ্র মানুষ বঞ্চিত হয়। সরকার ও সরকারী দলের নির্দেশে বিচারের রায় দেয়া হয়। মজলুম ব্যক্তি বিচার পায় না।

৫) পুলিশ প্রশাসনঃ পুলিশ, প্রশাসনকে ব্যাবহার করে সরকার, সরকারী দল যাকে ইচ্ছা তাকে গ্রেফতার করতে পারে, জেল দিতে পারে। প্রতিপক্ষকে নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে পুলিশ, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থাকে ব্যাবহার করা হচ্ছে।

৬) বিনোদনঃ বিনোদনের জন্য গান, নাচ, নাটক, সিনেমা, রেস্তুরেন্ট, মদের বার, পতিতালয়, খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

৭) শিক্ষাঃ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতি ভিত্তিক বিজ্ঞান, সাহিত্য, ব্যবসায় প্রশাসন, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়। এরাই সমাজে সবচেয়ে বড় অংশ এবং শাসন ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তারকারী শ্রেণী। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আছে যাতে মূলত সমাজের দরিদ্র লোকেদের সন্তানরা পড়ে যাদের সমাজে প্রভাব কম।

৮) বঙ্গ অঞ্চলে আরেক দল আছে যারা যুদ্ধ করে এই অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এরা অনেক সময়-ই বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনীর (পাকিস্থানের আইএসআই, ইসরাইলের মোসাদ, ভারতের 'র' এর) ধোঁকায় পড়ে বোমা ফাটিয়ে এই দেশে ইসলামি শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা কঠিন করে ফেলেছে। এরা জন বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সাধারণ মুসলিমরা এদের গ্রহন করেনি তাই এদের দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে না। এদের কর্মপন্থা ভুল।

৯) আপনি বা যে কোন আলেম, মুফতি, মুহাদ্দিস যখন-ই এই দেশে ইসলামী শরিয়া প্রতিষ্ঠার কথা বলবেন তখন এই দেশের মানুষের চোখের মানুষের সামনে ভেসে উঠে আফগানিস্থানের কথা বা ইরানের কথা - যে সব ভূখণ্ডে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় আছে। এই দেশের মুসলিমরা আফগানিস্থানে শরিয়া আইন কায়েম করা দেখেছে- যেখানে মেয়েদের বুরখা / হিজাব ছাড়া ঘর থেকে বের হতে দেয় না - বের হলে বেত্রাঘাত করা হয়, এমন কি মেয়ের বাবাকেও শাস্তি দেয়া হয়। ১২ বছরের পর মেয়েদের লেখাপড়া করতে দেয়া হয় না। ইরানেও মেয়েদের হিজাব না পড়লে জেল, জরিমানা দেয়া হয়, ব্যভিচারের জন্য পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয় বা শিরচ্ছেদ করা হয়, ইত্যাদি। ইসলামী শরিয়ার কথা শুনলে এই সব বিষয়গুলো যখন এই অঞ্চলের মানুষের মনে পড়ে তখন তারা ইসলামী শরিয়া আইন আর চায় না।

১০) নেতৃত্ব এবং চাকরী নিয়ে দ্বন্দ্বঃ বঙ্গ অঞ্চলের মাদ্রাসা থেকে পাস করা আলেমদের কথা শুনলে বুঝা যায় যে, ইসলামী শরিয়া কায়েম হলে তারা দেশ চালাবে, বিচারক হবে, সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে তারা বসবে, সকল সুযোগ – সুবিধা তারা নিবে সুতরাং এটা বর্তমান প্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগের সাথে তাদের স্বার্থের একটি দ্বন্দ্বের কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ওয়াজের মাহফিলে মাদ্রাসা থেকে পাস করা আলেমরা বলেন যে, এই এলাকার খতিব সাহেবের কাছ থেকে সকল সরকারী নির্দেশনা আসবে। তখন, সাধারণ মানুষ চিন্তা করে যে, আমার ছেলে যে UNO (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা), তার কি হবে? ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় বাধা এটি যে আমাদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপটি মনে করে যে, ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা হলে মাদ্রাসা থেকে পাস করা ছেলেরা সব চাকরী, সরকারী পদ নিয়ে নিবে এবং ব্যবসায় তারা বেশি সুবিধা পাবে ফলে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের তখন কোন মূল্য থাকবে না। বিভিন্ন ওয়াজে বা কথা বার্তায় আলেম সমাজ এটা প্রকাশও করেছে যে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা হলে মাদ্রাসা থেকে পাস করা ছেলে-মেয়েরাই দেশ চালাবে - সুতরাং এটা জেনারেল

থেকে পাস করা ছেলেমেয়েদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে। বাংলা অঞ্চলের জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের ইসলামী শরিয়া আইন না চাওয়ার এটা একটা বড় কারণ।

অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মাদ্রাসা থেকে বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসা থেকে যারা পাস করেছে তারা জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত ইসলাম প্রচারকারীদের ও মুসলিম সমাজে প্রভাব বিস্তারকারীদের পছন্দ করতে পারছে না কারণ নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব। বাংলার আলেম সমাজ মনে করছে যে, ইসলাম সম্পর্কে তারাই কথা বলবে এবং নেতৃত্ব দিবে যদিও জেনারেল থেকে পাস করা ছেলেদের বর্তমানে বঙ্গ অঞ্চলে ইসলাম এই পর্যায়ে আসার পিছনে বড় অবদান আছে। বাংলাদেশে গনতন্ত্রবিহীন ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠার ডাক বা খিলাফতের ডাক বড় আকারে প্রথম তাদের কাছ থেকেই এসেছে। সবচেয়ে বেশি জেল, জুলুম তারা স্বীকার করেছে। এই অঞ্চলে ইসলামের জন্য সবচেয়ে কোরবানি তাদের - আপনি স্বীকার করেন বা না করেন – এটাই সত্য। ২০০৯-২০১০ সালে যখন আলেম -ওলামাদের উপর কোন জুলুম শুরু হয়নি তখন থেকেই বিভিন্ন কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছেলে যারা গণতন্ত্রবিহীন ইসলামী শরিয়া আইন বা খিলাফত এই দেশে চালু করার ডাক দিয়েছে এবং প্রচার করেছে তাদেরকে তৎকালীন হাসিনা সরকার গ্রেফতার করে জেল দিয়েছে, পিটিয়েছে, নির্যাতন করেছে। এরাই আলেম – ওলেমাদের গণতন্ত্রবিহীন ইসলাম এই দেশে প্রতিষ্ঠার জন্য জাগ্রত করেছে। যারা আগে ইসলাম গ্রহন করে এবং প্রচার করে তাদের সম্মান ও মর্যাদা পরে যারা ইসলাম গ্রহন করে তাদের চেয়ে বেশি। এখনো,২০২৫ সালে, মাদারাসা থেকে পাস করা বেশিরভাগ আলেম ও তাদের নেতারা গনতন্ত্র মানে, নির্বাচন করে, ইসলামে গণতন্ত্র আছে - এই কথা প্রচার করে।

যদি কওমী মাদারাসা থেকে কোন ঈমানদার, জ্ঞানী দল আসে যাদের নেতা হবেন শিরকমুক্ত, গণতন্ত্রমুক্ত, পীরতন্ত্রমুক্ত, যোগ্যতা সম্পন্ন তাহলে তার বা তাদের প্রথম কাজ হবে কওমী মাদারাসা থেকে পাস করা ভণ্ড, সুবিধাভোগী আলেমদের আলেমের তকমা ছিঁড়ে ফেলা। সুবিধাভোগী, টাকার গোলামি করা, তাগুতের পা চাটা আলেমদের কওমি অঙ্গন থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করা এবং হালুয়া রুটি খাওয়া সরকারী আলেমদের আলেমের সার্টিফিকেট বাতিল করা। এই কাজটা আলেমদেরকেই করতে হবে। তারা জানে তাদের ভিতরে ভণ্ড, গণতন্ত্রপন্থী, পীরতন্ত্রপন্থী, সরকারের পা চাটা, সুবিধাভোগী, টাকার গোলামি করা আলেম কারা কারা আছে - এদেরকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়া হবে না।

১১) বঙ্গ অঞ্চলে ইসলামী শরিয়া প্রতিষ্ঠা হলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়টি কি হবে তা নিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিরা চিন্তিত হবেন – এটাই স্বাভাবিক। এটা এই অঞ্চলে ইসলামী

শরিয়া প্রতিষ্ঠায় একটি বাধা। কারণ বুদ্ধিজীবীরা দেখেছে যে, আফগানিস্থান এবং ইরানের উপর আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। ফলে বঙ্গ অঞ্চলের বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের একটা আশংকা যে, বাংলাদেশে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা হলে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই রাষ্ট্রের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিবে, ভারতও দিবে - এমন সম্ভাবনাই প্রবল। এই ক্ষেত্রে আমরা কি করবো? বাংলাদেশ তো গার্মেন্টস রপ্তানি থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, বাংলাদেশে সার উৎপাদন করতেও গ্যাস আমদানি করতে হয়। তাছাড়া বাংলাদেশে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা হলে আমেরিকা, ইসরায়েলের সহযোগিতায় ভারত হামলা করতে পারে এমন আশংকা প্রবল। এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ এবং সেনাবাহিনী কি এই ঝুকি নিবে? আপনার মহল্লার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া - ফুটপাথের ডিম বিক্রেতা উত্তর দিবে যে, আল্লাহ প্রচুর রিজিক দিবেন, ভারত কিছু করতে পারবে না, ইত্যাদি কিন্তু আমরা যারা ইসলাম সম্পর্কে জানি, তারা জানি যে, মদিনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরও মুহাম্মাদ সাঃ কে ক্ষুধার জালায় পেটে পাথর বেধে খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন করতে হয়েছে। যদি ঐ ডিম বিক্রেতাকে বলা হয় যে, ইসলামী শরিয়া প্রতিষ্ঠা হলে তোমার ঘরে ২-৩ দিন খাবার না-ও থাকতে পারে তাহলে সে কি এটা মেনে নিবে? সে কি ইসলামের জন্য স্ত্রী সন্তানসহ অনাহারে থাকতে রাজি হবে? এই বিষয়গুলো শিক্ষিত লোকেরা বুঝেন তাই, তাদের মধ্যে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠায় অনীহা রয়েছে।

ইসলাম প্রচারে নবীর সাঃ নির্দেশ এবং শর্ত

এতক্ষন আমরা শধু নবী সাঃ এর মুয়াজ বিন জাবালকে দেয়া উপদেশের একটি বাক্য নিয়ে আলোচনা করলাম।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয বিন জাবালকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বললেন। "তুমি কিতাবধারীদের সংস্পর্শে আসবে………..."।

এখন আমরা দেখব মুয়াজ ইবনে জাবালকে আল্লাহ এর রসূল সাঃ কি কি উপদেশ এবং শর্ত দিয়েছিলেন।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুআয ইবন জাবালকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বললেন। "আপনি কিতাবধারীদের সংস্পর্শে আসবেন, এবং যখন আপনি তাদের কাছে পৌঁছাবেন,

তখন তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত দূত। **এবং যদি** তারা তাতে আপনাকে মেনে নেয়, তবে তাদের বলুন যে আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।......।"

আমরা যে ভূখণ্ডে ইসলাম প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি সে সম্পর্কে নবীর সাঃ নির্দেশনা মত আমরা সেই অঞ্চলের লোকদের চিন্তা -ভাবনা, বিশ্বাস, শাসন ব্যবস্থার সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা নিয়েছি এবং বুঝতে পেরেছি যে, আমরা যে দাওয়াত তাদের দিবো তা গ্রহন করতে তারা কোথায় কোথায় বাধা অনুভব করছে বা করবে। সুতরাং দাওয়াত দেবার সময় তারা যে যে জায়গায় আমাদের দাওয়াত গ্রহনে বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে সেই বাধাগুলো যতটা সম্ভব দুর করতে চেষ্টা করব। তারা মুখে এই সকল বাঁধার বিষয়ে আমাদের না বললেও স্বঃ প্রণোদিত হয়ে আমরা তাদের এই সকল বাধা দুর করতে চেষ্টা করব, সেভাবে ইসলামী শরিয়াকে তাদের কাছে উপস্থাপন করব।

এখন আমরা বাংলা অঞ্চলের মানুষকে ইসলামী শরিয়া প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দিবো। ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহন করার দাওয়াত দিবো। দাওয়াতটি হচ্ছে নবীর ভাষায়, "তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত দূত।" এই দাওয়াতটি তাদেরকে আমরা বুঝিয়ে দিবো যে, আপনি এই কথা স্বীকার করার মাধ্যমে স্বীকার করছেন যে, আইন বিধান দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ, আপনি একমাত্র আল্লাহ এর আইন মেনে চলবেন, একমাত্র আল্লাহ এর আনুগত্য করবেন। আপনি যদি এই কালিমা স্বীকার করে নেন তারপর আপনি অন্য কারো আইন বা হুকুম মেনে চলতে পারবেন না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইনদাতা বলে মানতে পারবেন না। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন সিস্টেমকে স্বীকৃতি দিতে পারবেন না। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, পীরতন্ত্র ইত্যাদিকে আপনার অস্বীকার করতে হবে। আপনাকে আরও বিশ্বাস ও স্বীকার করতে হবে যে মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর প্রেরিত দূত অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাঃ এর কাছে আল্লাহ এর পক্ষ থেকে আল্লাহ এর বানী বা কথা এসেছিল যার নাম কোরআন। মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর প্রেরিত দূত অর্থাৎ উনার কাছ থেকে আমরা আল্লাহ এর হুকুম বা আইন জেনে নিবো তারপর আল্লাহ এর সেই হুকুম বা আইন মেনে চলবো। কোরআন বুঝে বুঝে পড়লে আপনি আল্লাহ এর আইন সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং হাদিস পড়লে আপনি মুহাম্মাদ সাঃ এর বানী সম্পর্কে

জানতে পারবেন যা মূলত আল্লাহ এর দেয়া আইন কারণ মুহাম্মাদ সাঃ নিজ থেকে কোন কথা বলেন নি, আল্লাহ উনাকে যা বলতে বলেছেন তিনি তাই বলেছেন।
এখন ঐ ব্যক্তি যেহেতু পূর্ব থেকেই ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানে এবং যেহেতু সে মুসলিম সমাজে জন্ম নিয়েছে এবং না বুঝেই কালিমা পড়েছে, নামাজ পড়েছে, রোজা রেখেছে তাই সে আপনাকে প্রশ্ন করতে পারে যে, আলেমদের মানব না? মসজিদের ইমাম বা আলেমদের মুখে তো কখনো এই কথা শুনলাম না যে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আইনদাতা মানা যাবে না বা গণতন্ত্র মানা যাবে না ! গণতন্ত্র মানলে শিরক হবে, ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে - এই কথা আলেমরা বলে না তুমি কোথা থেকে পাইলা? তুমি কি জানো না যে, আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ? আলেমগণের কথা মানব না তো কি তোমার কথা মানব? জামাতে ইসলামী নির্বাচন করে, চরমোনাই পীর গণতন্ত্র মানে, মামুনুল হক নির্বাচন করতেসে, এত বড় বড় আলেম গনতন্ত্র মানতেসে; ইসলামী শরিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য তারা কত কাজ করতেসে, ওয়াজ করতেসে, নির্বাচন করতেসে, জেলে গেসে, হাসিনার নির্যাতন সহ্য করসে, ইত্যাদি।

কিন্তু কালিমার দাওয়াতটি যদি একজন জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিকে দেন অর্থাৎ যিনি আমাদের অ্যানালাইসিসে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপের সদস্য, যিনি হয়তো সপ্তাহে শুধু একদিন জুম্মার নামায পড়েন তিনি আপনার কথা বুঝবেন কারণ সাধারণত এই ধরণের লোকেরা কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে না, তারা চিন্তা-ভাবনা করে তারপর গ্রহন বা বর্জন করে। তিনি আপনাকে বলতে পারেন যে, ভাই আপনার কথা বুঝলাম কিন্তু চোরের হাত কাটার আইন বা ব্যভিচারের জন্য পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি বর্তমানে কে মানবে বলেন? এই ধরণের ব্যক্তির জন্য আমাদের এখনকার আলোচনা। বর্তমানে, এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপের লোকদের অন্তত অর্ধেক যদি ইসলামী শরিয়া না চায় তাহলে এই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সময় যখন মানুষকে ইসলামের দাওয়াত হত তখন কোরআন সম্পূর্ণ নাযিল হয়নি, মানুষ জানত না যে, তাকে কি কি আইন মেনে চলতে হবে, তখন মানুষ আগে ঈমান এনে মুসলিম হয়েছে বা আগে ইসলাম গ্রহন করেছে পরে ইসলামী শরিয়া আইন সম্পর্কে জেনেছে কিন্তু এখন মানুষ ইসলাম গ্রহন করার আগেই ইসলামের সকল শরিয়া আইন সম্পর্কে জানে পরে ইসলাম গ্রহন করে তাই এখন দাওয়াতের প্রক্রিয়া একটু অন্যরকম হবে - তবে তা নবী সাঃ এর নির্দেশনা মোতাবেকই হবে।

এখন আপনি কাউকে নবী সাঃ এর ইসলাম গ্রহন করার দাওয়াত দিলে উক্ত ব্যক্তির মনে প্রথমেই আফগানিস্থান এবং ইরানের চিত্র মনের মাঝে ফুটে উঠবে এবং সে মনে করবে যে, ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা হলে আমাদের দেশও আফগানিস্থানের মতই হবে - যেখানে মেয়েদের লেখাপড়া করতে দেয় না, পর্দা ছাড়া বের হতে দেয় না, ইত্যাদি - ফলে সে ইসলাম গ্রহন করবে না। তাই আমাদেরকে আগেই তাদেরকে বলতে হবে যে ইসলাম কি ? ইসলামী শরিয়া আইন কি ? ঈমান কি ? মুসলিম ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য কি? ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা হলে কি কি আইন তাদেরকে মেনে চলতে হবে, ইত্যাদি। তাই, আমি এখন এই সকল মানুষের জন্য অর্থাৎ যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং এ লক্ষে কাজ করছেন তাদের জন্য এবং যারা ইসলাম সম্পর্কে, ইসলামী শরিয়া আইন সম্পর্কে জানেন না - তাদের জন্য ইসলাম কি? ঈমান কি? মুসলিম কে? শরিয়া কি? মুসলিম ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য কি? ইসলামী শরিয়া আইন কি? ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা হলে দেশের অবস্থা কি হবে? আর্থ-সামাজিক অবস্থা কি হবে? ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা হলে মানুষকে কি কি আইন মেনে চলতে হবে? ইত্যাদি বিষয় বুঝিয়ে বলব। আল্লাহ চাইলে, এতে যারা ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করছেন তাদের কাজ করতে সুবিধা হবে এবং যারা মুহাম্মাদ সাঃ এর আনীত শিরক, কুফরমুক্ত ইসলামের দাওয়াত পাবার পর তা গ্রহন করবেন কি না - চিন্তা-ভাবনা করছেন তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহনে সুবিধা হবে।

প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ইসলাম কি?

ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে কিছু বিশ্বাসের কথা আছে আবার পৃথিবীতে মানবজাতির সামাজিকভাবে জীবন যাপনের জন্য আইনও আছে। ইসলামে কিছু আইন আছে মানবজাতির সকলের জন্য, কিছু আইন আছে শুধু মুসলিমদের জন্য আবার কিছু আইন আছে যারা মুমিন বা বিশ্বাসী হতে চায় তাদের জন্য। কে বিশ্বাসী হতে চায় আর কে চায় না সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রে বা মুসলিম শাসক বা খলিফা কোন হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখেন না। এটা ব্যক্তি এবং আল্লাহ এর মধ্যকার ব্যাপার। যেমনঃ মুনাফিকরা যুদ্ধে যেত না এবং এজন্য তারা বিভিন্ন কারণ দেখাত যা ছিল মূলত ধোঁকাবাজি কিন্তু মুহাম্মাদ সাঃ কখনো তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেন নি। কেউ যদি মুসলিম বলে নিজেকে ঘোষণা দেবার পর এবং মৌখিকভাবে ইসলামের বিশ্বাসগুলো স্বীকারের পর অন্তরে তা অবিশ্বাস করে এবং মুমিন হতে না চায় তাহলে সেটা তার এবং আল্লাহ এর মধ্যকার ব্যাপার। এই ব্যাপারে, মুসলিম শাসক বা খলিফার কিছু করার নেই। সামাজিকভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম

হবার কারণে সে খলিফার কাছ থেকে একজন মুসলিম যত সুযোগ সুবিধা পায় - তার সকল সুযোগ সুবিধাই পাবে কিন্তু সে আখিরাতে জান্নাত পাবে না। সে জবাবদিহি করবে একমাত্র আল্লাহ এর কাছে। ইসলাম গ্রহনের পর কে ঈমানদার আর কে ঈমানদার নয় তা নিরূপণ করা খলিফার কাজ নয়। এই কাজ মুহাম্মাদ সাঃ করেন নি। কারো ঈমানের উপর ভিত্তি করে তাকে শাস্তি বা সুযোগ- সুবিধা দেয়া যাবে না। ইসলামী রাষ্ট্রে ২ ধরণের মানুষ থাকবে যথাঃ মুসলিম এবং অমুসলিম। এই দুই শ্রেণীর জন্যই আইন থাকবে কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্য আলাদা আইন থাকবে না। কিন্তু কোরআন – হাদিসে যেহেতু যারা বিশ্বাসী হতে চায় তাদের জন্য আলাদা আইন দেয়া আছে তাই আমাদেরকে তিনটি গ্রুপ বা শ্রেণী নিয়ে আলোচনা করতে হবে। শ্রেণী তিনটি হচ্ছে, মুসলিম, মুমিন (বিশ্বাসী), অমুসলিম।

খলিফা বা মুসলিম শাসককে শর্ত দিয়ে বায়াত (অঙ্গীকার) দেয়া

একজন ব্যক্তি যদি চায় যে সে ইসলাম গ্রহন করবে না কিন্তু ইসলামের কিছু নিয়ম বা আইন মেনে নিয়ে সে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে তাহলে এটা করার নিয়ম কি ইসলামে আছে। হ্যাঁ, আছে।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত:

ওহাব বলেন: আমি জাবিরকে জিজ্ঞাসা করলাম সাকীফের বাইয়াত গ্রহণের সময় তাদের অবস্থা কী ছিল। তিনি বলেন: তারা নবীকে (সাঃ) শর্ত দিয়েছিল যে তাদের উপর কোন সাদাকা (অর্থাৎ যাকাত) এবং জিহাদ (আল্লাহর পথে সংগ্রাম) থাকবে না। (এই দুই শর্তে তারা নবীকে সাঃ বায়াত দিয়েছিল)

এরপর তিনি নবীকে (সাঃ) বলতে শুনেছেন: পরবর্তীতে তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখন তারা সাদাকা (যাকাত) দেবে এবং জিহাদ (আল্লাহর পথে সংগ্রাম) করবে। (সুনান আবু দাউদ ৩০২৫) (গ্রেড: সহীহ (আল-আলবানী)

খেয়াল করে দেখুন, আল্লাহ এর রসূল সাঃ সাকীফের লোকদের সম্পর্কে কি বলেছেন? তিনি বলেছেন যে, "**পরবর্তীতে তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করবে** তখন তারা সাদাকা (যাকাত) দেবে এবং জিহাদ (আল্লাহর পথে সংগ্রাম) করবে"। বুঝা গেলো, সাকিফের লোকেরা যে যাকাত এবং জিহাদ না করার শর্তে বায়াত দিয়েছিল তাতে তাদের ইসলাম গ্রহন করা হয়নি (কারণ মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন যে,"পরবর্তীতে তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করবে…….।") কিন্তু নেতা এবং সরকার প্রধান হিসেবে মুহাম্মাদ সাঃ কে তারা মেনে নিয়েছিল এবং যাকাত, জিহাদ ছাড়া ইসলামের অন্য আইন-কানুন তারা মেনে নিয়েছিল; যেমনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায তারা মেনে নিয়েছিল। সুতরাং বুঝা গেলো যে, ইসলাম

গ্রহন না করেও ইসলামের কিছু আইন কানুন মেনে চলার অঙ্গীকার মুসলিম খলিফা বা শাসকের কাছে করা যায়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা হিসেবে মেনে নিচ্ছেন, মুসলিম শাসককে রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে মেনে নিচ্ছেন। ইসলামী শরিয়াকেও মেনে নিচ্ছেন তবে কিছু করনীয় কাজ যেগুলো ইসলামে ফরয তা থেকে, খলিফার অনুমতি নিয়ে, নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন।

এভাবে তাদের থেকে বায়াত (অঙ্গীকার) নেয়ার পিছনে বিজ্ঞতা এটা হতে পারে যে, ধীরে ধীরে তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় উক্ত কাজ সমূহ করবে এখন যা তারা - না করার ব্যাপারে শর্ত দিয়ে বায়াত দিয়েছে। যেমনঃ আপনার বন্ধুরা সবাই যদি মদ খায় এবং তারা যেই আসরে মদ খায় সেই আসরে যদি আপনিও তাদের সাথে আড্ডা দেন তাহলে এমন সম্ভাবনাই বেশি যে আপনিও তাদের সাথে মদ খাওয়া ধরবেন। মানুষ তার পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এভাবে তাদের থেকে বায়াত নেয়ার মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের কাছে আসার সুযোগ দেয়া হয়েছে, তাদেরকে মুসলিম সমাজে মেশার সুযোগ দেয়া হয়েছে যাতে তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পরিপূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহন করে। একটি অবিশ্বাসী, দুনিয়াদার সমাজে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে। মানুষ যেন ইসলামী শরিয়াকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে সহজে গ্রহন করতে পারে এজন্য সর্বোচ্চ যতটুকু ছাড় দেয়া যায় ততটুকু ছাড় দিতে হবে। কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে যে - ছাড় দিতে গিয়ে যেন শিরক বা কুফরকে প্রস্রয় দেয়া না হয়। আমলের দিক থেকে এমন কিছু ছাড় দেয়া যেতে পারে যাতে ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষতি না হয়। উক্ত ঘটনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়নি বরং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিরক্ষার দিক থেকে আরও শক্তিশালী হয়েছে।

তাহলে বুঝা গেল, একজন মানুষ বা একটি দল বা গোষ্ঠী চাইলে ইসলাম গ্রহন না করে মুসলিম শাসক বা খলিফার কাছে ইসলামী শরিয়ার কিছু নিয়ম কানুন বা আইন মানার ব্যাপারে বায়াত দিতে পারে। অর্থাৎ সে ইসলাম গ্রহন করছে না কিন্তু ইসলামের কিছু অংশ বা আইন কানুন মেনে চলার অঙ্গীকার সে মুসলিম শাসকের কাছে করছে। যেমনঃ একজন অমুসলিম বা অমুসলিমদের একটি দল একজন মুসলিম শাসকের কাছে বায়াত দিতে পারে যে, তারা ইসলাম গ্রহন করবে না, ইসলামে যে সকল বিশ্বাসের কথা বলা আছে তা তারা গ্রহন করবে না কিন্তু ইসলামী শরিয়ার শুধুমাত্র ফৌজদারি আইন তারা মেনে চলবে। বিশ্বাসের দিক থেকে তারা অমুসলিমই থাকবে কিন্তু ইসলামী শরিয়া আইনের ফৌজদারি আইন (Criminal Law) মেনে চলার অঙ্গীকার তারা খলিফার কাছে করতে পারে। তাহলে,

সে ইসলামের কতটুকু গ্রহন করেছে? শুধু ফৌজদারি আইন (Criminal Law). তাহলে সে কি ইসলাম গ্রহন করেছে ,উত্তরঃ না, সে ইসলাম গ্রহন করেনি। সে শুধু ইসলামের কিছু আইন মেনে চলার অঙ্গীকার করেছে। সে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের কাছ থেকে সকল ধরণের নিরাপত্তা এবং সুযোগ সুবিধা পাবে। খুব সম্ভবত এরা একজন মুসলিমের মতই সুযোগ সুবিধা পাবে যারা যাকাত এবং জিহাদ না করার শর্তে নবীর সাঃ কাছে বায়াত দিয়েছিল।

এখন আমরা আসব এমন দল বা গোষ্ঠী সম্পর্কে যারা ইসলামী শরিয়া আইন মেনে নিতে চায় কিন্তু তারা গাফেল যেমন ঠিকমতো নামাজ পরে না, রোজা রাখে না, ইত্যাদি। যারা নামায পড়ে না তারা প্রকৃত অর্থে মুসলিম না হলেও তাদেরকে অমুসলিম বলা যায় না কারণ আলবানী এবং অন্য আরও অনেক প্রখ্যাত আলেমের মতে, শুধুমাত্র যারা একদম-ই নামায পড়ে না - তারা নামায না পড়ার কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফির ঘোষিত হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সপ্তাহে শুধু জুম্মার নামায অর্থাৎ ১ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছে তাকেও রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফির বলা বা কাফির হিসেবে চিহ্নিত করা সমীচীন এবং বিজ্ঞতার কাজ হবে না।

‘আবদুল্লাহ বিন বুরাইদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:

“রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ‘আমাদের এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যকারী চুক্তি হল নামাজ; সুতরাং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করল, সে কুফরী করল।” (সুনান ইবনে মাজাহ ১০৭৯)

“মানুষ এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে (আর কিছুই) দাঁড়ায় না, কেবল সালাত।” (ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে অনুরূপ অন্যান্য হাদীস সহ বর্ণনা করেছেন)।

একজন মুসলিম যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত (নামায) না পড়ে তাহলে সে কাফির হবে কি না - এ ব্যাপারে মত পার্থক্য আছে।

ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন: আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), মুআয ইবন জাবাল, ইবনে মাসউদ, কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) এবং ইবনে আল মুবারক, আহমদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ইবন রাহাওয়ায়াহ (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) থেকে মোট সতেরো জন বর্ণনা করেছি যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং জেনেশুনে কোন ফরয সালাত আদায় না করে, যতক্ষণ না এর সময় শেষ হয়ে যায় (যতক্ষণ এর ওয়াক্ত থাকে ততক্ষনের ভিতরে) , সে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যায়। এটি মালিকের সাহাবী আব্দুল্লাহ

ইবনুল মাজিশুন এবং আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব আল-আন্দালুসী এবং অন্যান্যদের মতামত। (আল-ফাসল ফী'ল-মিলাল ওয়াল-আহওয়া' ওয়াল-নিহাল (৩/১২৮))।

অর্থাৎ এক ব্যক্তি যদি জুম্মার নামায পড়ে কিন্তু আসর না পড়ে এবং আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। তাহলে সে জুম্মা থেকে মাগরিব পর্যন্ত মুসলিম ছিল কিন্তু আসরের ওয়াক্ত শেষ হবার সাথে সাথে সে কাফির হয়ে যায় কারণ সে ইচ্ছাকৃতভাবে আসরের নামাজ পড়েনি - এটি মালিকের সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনুল মাজিশুন এবং আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব আল-আন্দালুসী এবং অন্যান্যদের মতামত।

শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বায ও এই একই ফতোয়া দিয়েছেন। (ফতোয়া আল লাজনাহ আল ধামিয়াহ (৬/৪০,৫০)।

শাইখ ইবনে উতাইমিনকে এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে মাঝে মাঝে নামায পড়ে এবং অন্য সময়ে নামায পড়ে না। সে কি কাফির?

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: আমি মনে করি, যে সে কাফির নয় যতক্ষণ না সে একেবারে নামায পড়া ছেড়ে দিয়েছে। যে কখনও কখনও নামায পড়ে, সে কাফির নয় কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মানুষ এবং কুফর,শিরকের মাঝে তার নামায ত্যাগ করা রয়েছে।" তিনি "এক ওয়াক্ত নামাজ ত্যাগ করা" (তারকু সালাতীন) বলেন নি বরং তিনি বলেছেন "নামাজ ত্যাগ করা" (তারক আল-সালাহ)। এর অর্থ সম্পূর্ণরূপে নামায না পড়া। একইভাবে তিনি বলেছেন: "আমাদের এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যকারী চুক্তি হল নামায; যে নামায পড়ে না সে কাফির।" এর ভিত্তিতে আমরা বলি: যে কখনও কখনও নামায পড়ে এবং কখনও কখনও নামায পড়ে না সে কাফির নয়। মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে উতাইমিন (১২/৫৫)।

যে ব্যক্তি শুধু জুম্মার নামাজ অভ্যাসবশত পড়ে তাকেও শাইখ ইবনে উতাইমিন কাফির বলেন নি। এখন আমরা জানব, এমন ব্যক্তির কথা যিনি মুহাম্মাদ সাঃ এর কাছ থেকে দিনে মাত্র দুই ওয়াক্ত নামায পড়ার ব্যাপারে বায়াত দিয়েছিলেন এবং উনার বায়াত নবী সাঃ গ্রহন করেছিলেন। হাদিসটি মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে। আমি হাদিসটির রেফারেন্স নাম্বার খুঁজে পাইনি কিন্তু আরব বিশ্বের আলেমরা এই বিষয়ে জানেন, আপনারা এই ব্যাপারে ইন্টারনেটে খুজলেই পেয়ে যাবেন। হাদিসটি আলবানীর মতে সাহিহ।

যদি খলিফা বা শাসক রাজি হন তাহলে একজন ব্যক্তি দিনে ২ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার শর্তে ইসলাম গ্রহন করতে পারে।

আল-আনসারের বাকি অংশের মুসনাদে

حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم الليثي، عن رجل منهم، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه

মুহাম্মদ ইবনে জাফর (যাকে গান্দারও বলা হয়) থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, তিনি শো'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে (ইবনে দিয়ামা থেকে) নাসর ইবনে আসিম থেকে (ইবনে ওমর আল-লাইসী) তাদের একজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এই শর্তে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যে, তিনি দিনে দু'বার সালাত ছাড়া সালাত আদায় করবেন না এবং তাঁর কাছ থেকে তা কবুল করা হয়েছিল।

حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن رجل منهم، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين، فقبل ذلك منه

বসরী বর্ণনাকারীদের প্রথম মুসনাদে:

আমরা ওয়াকিয়া (ইবনুল জারাহ) থেকে শো'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) থেকে কাতাদ (ইবনুল দিয়ামা) থেকে নাসর ইবনে আসিম (ইবনুল ওমর) আল-লাইসী থেকে তাদের একজনের সূত্রে জানতে পেরেছি যে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে (প্রতিদিন) কেবল দু'বার সালাত আদায় করার শর্তে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তার কাছ থেকে তা কবুল করা হয়েছিল। (মুসনাদে আহমাদ)

শায়খ আল-আলবানী তাঁর কিছু বই, যেমন 'আত-সামার আল-মুসতাব ফি ফিকহ আস-সুন্নাহ ওয়াল-কিতাব'-এ উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিম শাসকদের জন্য একজন অমুসলিমের ধর্মান্তর (ইসলাম) গ্রহণ করা বৈধ, এমনকি যদি সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে রাজি না হয়। তিনি প্রমাণ হিসেবে নাসর ইবনে আসিমের হাদিস ব্যবহার করেছেন যে, তাদের মধ্যে একজন নবী (সাঃ)-এর কাছে এসেছিলেন এবং তিনি (প্রতিদিন) কেবল দুই বার নামাজ পড়ার শর্তে মুসলিম হয়েছিলেন এবং নবী (সাঃ) তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করেছিলেন। [মুসনাদে ইমাম আহমদ] শায়খ আল-আলবানী বলেছেন যে, এর বর্ণনাকারীদের ক্রম ইমাম মুসলিমের মানদণ্ড অনুসারে সহীহ (সহিহ)।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য হচ্ছে ইমাম আহমদ যিনি হাদিসটি সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি বলেছেন যে, উক্ত ব্যক্তি দিনে ২ ওয়াক্ত নামাজ পড়লেও কিয়ামতের দিন তাকে ৫ ওয়াক্ত নামাযের হিসাব-ই দিতে হবে।

এখানে বুঝার বিষয় হচ্ছে, উক্ত ব্যক্তি দিনে ২ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে দুনিয়াতে ইসলামী সরকার তাকে মুসলিম হিসেবে স্বীকার করবে এবং মুসলিমের সকল অধিকার সে পাবে এবং তাকে বাকি ৩ ওয়াক্ত নামাজের জন্য খলিফা বা ইসলামী রাষ্ট্র কিছু বলবে না বা জোর করে বা আইন করে বা শাস্তি দিয়ে তাকে বাকি ৩ ওয়াক্ত নামাজ পড়াবে না। এটা হচ্ছে ইসলামী সরকার বা খলিফার সাথে উক্ত ব্যক্তির চুক্তি কিন্তু আল্লাহ এর কাছে তাকে ৫ ওয়াক্ত নামাজের জন্যই জবাবদিহি করতে হবে। সাকিফের লোকদের যাকাত এবং জিহাদ ছাড়া বায়াত দেয়া এবং ইমাম আহমদের ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে উক্তির মূল্যায়ন করে আমি এই কথাগুলো বুঝেছি।

তাহলে, বুঝা গেলো, আল্লাহকে একমাত্র রব, আইনদাতা হিসেবে স্বীকার করে এবং মুহাম্মাদ সাঃ কে আল্লাহ এর রসূল বলে স্বীকার করে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মুসলিম শাসক বা খলিফাকে সরকার প্রধান বা রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে খলিফার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ইসলামের কিছু ফরয কাজ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েও সমাজে মুসলিম হিসেবে বসবাস করতে পারবে এবং মুসলিমের সকল অধিকার পাবে। তবে যে ফরয কাজগুলো তারা করছে না তার জন্য তারা আল্লাহ এর কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমা করবেন বা শাস্তি দিবেন। এটা তাদের এবং আল্লাহ এর মধ্যকার ব্যাপার। মুসলিম শাসক বা খলিফার এই ব্যাপারে কিছু করার নেই। এখন প্রস্ন আসবে - মুসলিম শাসক বা খলিফাকে আল্লাহ এই ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন না? আশা করা যায় প্রশ্ন করবেন না কারণ মুসলিম শাসক বা খলিফা এই কাজ নবীর সাঃ সুন্নত মোতাবেক করেছেন। এখন প্রস্ন আসবে যে, এতে তো ইসলামের ক্ষতি হয়ে গেলো? ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হল কিভাবে? নবীর সাঃ জ্ঞানের সাথে আমাদের জ্ঞানের পার্থক্য এখানেই। শক্তিশালী একটি গোষ্ঠী যদি আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা হিসেবে স্বীকার করে নেয়, ইসলামী শরিয়া আইনকে জীবন বিধান হিসেবে মেনে নেয়, মুসলিম শাসককে রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে মেনে নেয় তাহলে সমাজে বা রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সহজ হবে না কঠিন হবে? সহজ হবে। এখন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে মূল বিষয়, আল্লাহ একমাত্র আইনদাতা - এই কথাটা সমাজে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করাটাই মূল কথা।

এখন প্রশ্ন আসবে, ধরুন সমাজে বা রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে এবং ১০ বা ২০ বছর অতিক্রম হয়ে গেছে তাহলে যাদেরকে দিনে ২ ওয়াক্ত নামায পড়া সাপেক্ষে মুসলিম বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল

তাদেরকে কি এই সুবিধা থেকে বাদ দিয়ে ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে বলা হবে বা যাকাত দিতে বলা হবে? মুসলিমরা কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করে না এবং তাদের জন্য কাউকে ধোঁকা দেয়া হারাম করা হয়েছে। যাদেরকে কথা দেয়া হয়েছে তাদেরকে কখনোই যাকাত দিতে বা ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে জোর করা হবে না, ১০০ বছর চলে গেলেও এই প্রশ্নের উত্তরঃ না, তাদের জোর করা হবে না। তবে তারা যদি স্বেচ্ছায় যাকাত দেয় তবে তা গ্রহন করা হবে। যারা ২ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার অঙ্গীকারে বায়াত দিয়েছিল তারা যদি নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত -ই পড়ে তাহলে তা তাদের জন্যই ভালো, এই ব্যাপারে খলিফা বা মুসলিম শাসকের কিছু করার নেই। এখন দেখুন, ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা কত সহজ। কিন্তু ইসলাম কি সেটাই তো আমরা বুঝি নাই যে কারণে ৫০ বছরেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যায়নি বাংলাদেশে। বরং গনতন্ত্রের শিরক, পিরতন্ত্রের শিরক দিয়ে মুসলিম সমাজকে ভরে ফেলেছি। প্রায়ই বলা হয়, গনতন্ত্র ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠার অন্য কোন উপায় আমরা পাচ্ছি না, তাই গণতান্ত্রিক উপায়ে আমরা ভোট আর জোট করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি। শিরক না করেও খুব সহজেই সমাজে, রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যায় যদি আপনি নবী সাঃ এর কথা মেনে নেন এবং জ্ঞান অর্জন করেন। নবী সাঃ যা বলেছেন, যা করেছেন – তার চেয়ে যদি বাড়াবাড়ি করেন, বিভিন্ন আলেমের ব্যাখ্যা, ফিকহের দোহাই দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে কঠিন করে তুলেন তাহলে কখনো ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না আর এটাই বাংলাদেশে হয়েছে এবং হচ্ছে। নবীর চেয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে ইসলাম তো প্রতিষ্ঠা হচ্ছেই না বরং মুসলিমদের গণতন্ত্রের শিরকের গভীরে হারিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে বাংলাদেশে।

এতক্ষণ আমরা ইসলাম গ্রহনের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফাকে বায়াত দিয়ে মুসলিমের মত অধিকার নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জানলাম। একজন মুসলিম শাসকের মূল দায়িত্ব হচ্ছে তার দায়িত্ব প্রাপ্ত ভূখণ্ডের লোকেরা আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা বলে স্বীকার করে কি না ? ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকে মানে কি না, তাকে খলিফা হিসেবে স্বীকার করে কি না - তা নিশ্চিত করা। তাহলে বাংলাদেশের জনগণ যাদের মধ্যে নামাযীর সংখ্যা খুবই কম তাদের জন্য শরিয়া আইন লিখে যে প্রস্তাব আমরা দিবো তাতে কি লিখা থাকবেঃ

*) যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহকে একমাত্র রব (আইনদাতা) হিসেবে স্বীকার করে এবং মুহাম্মাদ সাঃ কে আল্লাহ এর রসূল বলে স্বীকার করে তাদেরকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে। তাদেরকে দিনে কমপক্ষে ২ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে। যদি তারা দিনে ২ ওয়াক্ত নামাজও না পড়ে তাহলে তাদেরকে অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা করা হবে। তারা অমুসলিম হিসাবে এই রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারবে এবং

একজন অমুসলিম একটি ইসলামী রাষ্ট্র থেকে যে সকল সুযোগ-সুবিধা পায় তারা সেই সকল সুযোগ-সুবিধা পাবে। উক্ত রাষ্ট্রে একটি তালিকা করা হবে যে কারা কারা ২ ওয়াক্ত, ৩ ওয়াক্ত, ৪ ওয়াক্ত, ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার ব্যাপারে মুসলিম সরকার প্রধান বা খলিফার কাছে বায়াত দিয়েছে। তারপর মুসলিম সরকার যারা যত ওয়াক্ত নামাজ পড়ার অঙ্গীকার করেছে তারা তত ওয়াক্ত পড়ছে কি না -সেই ব্যাপারে বছরে অন্তত একবার হলেও খোঁজ-খবর নিবেন। যদি কারো মাঝে মধ্যে নামাজ ছুটে যায় সেজন্য তো তাকে অমুসলিম ঘোষণা করা হবে না, যদি কেউ মাসের পর মাস নামাজ ত্যাগ করে তাহলে তাকে অমুসলিম ঘোষণা করা হবে। কিন্তু তাকে এজন্য অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না কারণ সে আল্লাহকে আইনদাতা হিসেবে অস্বীকার করেনি বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাড়ায় নি। সে একটি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে যার জন্য সে আল্লাহ এর কাছে জবাদিহি করবে। (বিভিন্ন মাজহাবে বা ফিকহে এই ব্যাপারে কঠিন আইনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাংলা অঞ্চলের জন্য আমার মতে সহজ আইন বাস্তবায়ন করতে হবে)

তাহলে, এই রাষ্ট্রে যে সকল মুসলিম বসবাস করবে তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে না? মুসলিমের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরয। এজন্য প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহি করবে। এ ব্যাপারে খলিফার কিছু করার নেই কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে খলিফার দায়িত্ব হচ্ছে সালাত প্রতিষ্ঠা করা বা সালাত কায়েম করা তাই খলিফা মুসলিমদের কাছ থেকে বায়াত বা অঙ্গীকার নিবে যে কে কত ওয়াক্ত নামাজ পড়বে - তারপর খলিফা বা ইসলামী সরকার ঐ ব্যক্তিকে ঐ অঙ্গীকার করা নামাজ পড়ছে কি না তা তার কাছ থেকে বুঝে নিবে অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি খলিফার কাছে অঙ্গীকার করা নামাজের ব্যাপারে খলিফার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে অন্য দিকে যে ওয়াক্তগুলোর ব্যাপারে সে খলিফার কাছে অঙ্গীকার করেনি সেই ব্যাপারে উক্ত ব্যক্তি খলিফার কাছে জবাবদিহি করবে না কিন্তু আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। আল্লাহ এর কাছে তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ব্যাপারেই জবাবদিহি করতেই হবে কিন্তু খলিফার কাছে শুধু অঙ্গীকার করা ওয়াক্তগুলোর জন্য উক্ত ব্যক্তিকে জবাবদিহি করতে হবে। মুসনাদে আহমদের হাদিস মোতাবেক খলিফা সর্বনিম্ন ২ ওয়াক্ত নামাজ পর্যন্ত পড়ার ব্যাপারে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে অঙ্গীকার নিতে পারবেন - এর চেয়ে কম পারবেন না - তাহলে খলিফা ইসলামী রাষ্ট্রে সালাত প্রতিষ্ঠা বা কায়েম করেছেন এই কথা বলা যাবে না, ফলে খলিফার গুনাহ হবে এবং উক্ত খলিফাকে সরিয়ে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা ইসলাম, ইসলামী রাষ্ট্র, খলিফার কাছে সরকার প্রধান হিসেবে বায়াতের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারলাম এবং ইসলামী রাষ্ট্রে সালাতের (নামাজের) ব্যাপারে কি আইন থাকবে তা বুঝতে পারলাম। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা মুসলিম এবং মুমিনের (বিশ্বাসী) মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে পারব। একজন বিশ্বাসী যদি সমাজ ছেড়ে বনে গিয়ে থাকে তবু সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ-ই পড়বে। খলিফা তার কাছে জবাবদিহি চাক বা না চাক তাতে তার নামাজে কম-বেশি হবে না। কে বিশ্বাসী আর কে বিশ্বাসী নয় – এটা ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকার খুঁজে দেখবে না বা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে মুসলিমদের ভাগ করবে না। এটা মুসলিম সরকার বা খলিফার কাজ নয়। বিশ্বাস অন্তরের ব্যাপার। বিশ্বাস সম্পর্কিত ব্যাপারের জন্য একজন মুসলিম শুধুমাত্র আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহি করবে। ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকার শুধু মানুষের বা মুসলিমদের বাহ্যিক আমল বা কাজ দেখবে। ইসলামী সরকার শুধু দেখবে যে, তার ভূখণ্ডে বসবাসকারী কেউ ইসলামী শরিয়া আইনের কোন আইনে শাস্তি যোগ্য অপরাধ করেছে কি না? যদি কোন ব্যক্তি এই রকম কোন অন্যায় বা অপরাধ না করে থাকে তাহলে তাকে শাস্তি দেয়ার কোন অধিকার ইসলামী সরকার বা খলিফার নেই।

আপনারা কি মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ কে আল্লাহ এর রসূল সাঃ কোন ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই হাদিসটি মনে রেখেছেন? আমরা এখনো কিন্তু কাউকে নামাজ পড়তে বলিনি, এখনো আমরা কালিমার দাওয়াত মানুষকে দিচ্ছি। মানুষকে বুঝাচ্ছি যে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই", "আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ" – এই কথা স্বীকার করার মাধ্যমে সে কি কি স্বীকার করছে। এরকম যেন না হয় যে - সে না বুঝেই কালিমা স্বীকার করে, নামাজ পড়ে কিন্তু আল্লাহ এর দেয়া ফৌজদারি আইন বাস্তবায়নের কথা বললে বলে যে, “আমি ঐ সব মানি না, আমি গণতান্ত্রিক ইসলাম মানি"।

আল্লাহ এর রসূল সাঃ মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ কে শর্ত দিয়েছিলেন যে, **যদি তারা কালিমার ব্যাপারে তোমাকে স্বীকার করে নেয়** তাহলে তাদেরকে ৫ ওয়াক্ত নামাজের কথা বলবে। সুতরাং আমাদের দেশের মানুষ আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা হিসেবে স্বীকার না করলে তাদেরকে নামাজের কথা বলা হবে নবীর (সাঃ) নির্দেশ অমান্য করা। আমাদের দেশের মসজিদে, ওয়াজে, সভায় আলেমরা, ইমামরা, মুহাদ্দিসরা নামাজের নিয়ম শিখায়, ওজু শিখায়, পিতা-মাতার অধিকার, ইত্যাদি শিখায় এমন লোকদের যারা ভোট দিয়ে আইনদাতা বানায় যারা সংসদে বসে আইন দেয় - সেই আইন আবার এই লোকেরা মানে - তারা তো আল্লাহকে সরাসরি আইনদাতা হিসেবে অস্বীকার করছে, তারা প্রকাশ্যে কালিমাকে অস্বীকার করছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে কিছু মানুষের আনুগত্য বা আইন মানার মাধ্যমে

অথচ এদেরকে আলেমরা, ইমামরা, মুহাদ্দিসরা নামাজের নিয়ম, ওজুর নিয়ম শিখায়। ভুল, বড় ভুল হচ্ছে। মুয়াজ বিন জাবালকে দেয়া **নবীর শর্ত** এবং নির্দেশ অমান্য করার কারণে গত ৫০ বছরেও এই দেশে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। আমি সকল আলেম, ইমামদের অনুরোধ করবো, আপনারা মুয়াজ বিন জাবালকে দেয়া নবীর শর্তটি মেনে চলবেন। ওয়াজের মাঠে গিয়ে বা জুম্মার খুতবায় নামাজের নিয়ম, ওজুর নিয়ম, পিতামাতা অধিকার, স্বামীর অধিকার, হিজাবের নিয়ম, ইত্যাদি আলোচনা করলে কিভাবে তা দেশে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগবে তা বোধগম্য নয়। "ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান" বা "আগামির বাংলাদেশ ইসলামের বাংলাদেশ" স্লোগান দিয়ে লাভ কি যদি নবীর শর্ত এবং নির্দেশনাই আমরা না মানি? তাহলে, আপনারা বয়ানে, ওয়াজে কি বিষয়ে কথা বলবেন? আপনারা মানুষকে বুঝিয়ে বলবেন যে, আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা - এই কথা না মানলে ইসলাম গ্রহন করা হয় না। গনতন্ত্র কেন শিরক, মানুষকে আইনদাতা বলে স্বীকার করলে কেন সেটা শিরক হয়; সার্বভৌমত্ব বলতে কি বুঝায়? সার্বভৌমত্বের মালিক কেন জনগণ হতে পারে না? কেন সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ? ইসলামী শরিয়া আইন দ্বারা সমাজ, রাষ্ট্র না চালালে কেন আপনি, আমি শিরকের মধ্যে পরে যাবো? গণতন্ত্র মানলে কেন আমরা ঈমানহীন হয়ে কাফির হয়ে মারা যাবো? ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা হলে কি কি আইন মানুষকে মেনে চলতে হবে, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিবেন। তাহলে, আপনি আল্লাহ এর রসূলের সাঃ নির্দেশ মোতাবেক ইসলাম প্রচার করলেন। যারা শিরক করছে, আল্লাহ এর আইনকে বাদ দিয়ে মানুষের আইন মানছে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষকে আইনদাতা মানছে - তাদেরকে নামাজের নিয়ম, ওজুর নিয়ম, স্বামীর অধিকার, পর্দার গুরুত্ব শিখালে তাতে নবীর নির্দেশ অমান্য করা হয় কারণ নবী মুয়াজকে শর্ত দিয়েছিলেন যে, ---"আপনি কিতাবধারীদের সংস্পর্শে আসবেন, এবং যখন আপনি তাদের কাছে পৌঁছাবেন, তখন তাদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত দূত। **এবং যদি তারা তাতে আপনাকে মেনে নেয়,** তবে তাদের বলুন যে আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।......।" এখন আমাদের দেশের মানুষ তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের আনুগত্য করছে, আল্লাহ এর আইন বাদ দিয়ে মানুষের দেয়া আইন মানছে তাহলে মানুষ তো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই – এই কথা গ্রহন করেনি তাহলে আমরা তাদেরকে হাদিস অনুসারে নামাজ পড়ার কথা বলি কিভাবে? কারণ নবী সাঃ শর্ত দিয়েছেন যে, যদি তারা মেনে নেয় যে, তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আইন মানবে না, অন্য কারো আনুগত্য করবে না

তাহলেই কেবল তাদেরকে ৫ ওয়াক্ত নামাজের কথা বলা যাবে। এখন আপনারাই চিন্তা করে দেখুন, নবী সাঃ কি করতে বলেছেন আর আমরা কি করছি।

মুসলিম ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য

বেদুঈনরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। বল- 'তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল, 'আমরা (মৌখিক) আনুগত্য স্বীকার করেছি' (মুসলিম হয়েছি), এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মান্য কর তাহলে তোমাদের কৃতকর্মের কিছুই কমতি করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা হুজুরাত -১৪)

সা'দ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা) লোকদের মধ্যে যখন যাকাত বন্টন করলেন , তখন আমি সেখানে বসে ছিলাম। কিন্তু আল্লাহর রাসূল একজন লোককে বাদ দিয়ে গেলেন যাকে আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মনে করতাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন তাকে (যাকাত না দিয়ে) বাদ দিয়ে চলে গেলেন? আল্লাহর কসম, আমি তাকে একজন বিশ্বাসী মুমিন মনে করি।" নবী (সা) বললেন: "অথবা কেবলমাত্র মুসলিম।" আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম, কিন্তু তার সম্পর্কে আমার জানার কারণে আমার প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি না করে পারলাম না। তারপর আল্লাহর রাসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি অমুককে কেন ছেড়ে চলে গেলেন? আল্লাহর কসম! তিনি একজন বিশ্বাসী মুমিন।" নবী (সা) আবার বললেন, "অথবা কেবলমাত্র মুসলিম।" আমি তার সম্পর্কে যা জানি তার কারণে আমার প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি না করে পারলাম না। তারপর নবী (সা) বললেন, "হে সা'দ! আমি এমন একজনকে দান করি অথচ অন্য একজন আমার কাছে বেশি প্রিয়, এই ভয়ে যে, আল্লাহ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন।" (সাহিহ বুখারি, খণ্ড ১, বই ২, সংখ্যা ২৬)

খেয়াল করে দেখুন, আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) বার বার-ই সাদকে রাঃ সংশোধন করে দিচ্ছিলেন এই কথা বলে যে, "অথবা কেবলমাত্র মুসলিম"। একজন মুসলিমকে বিশ্বাসী বলে ডাকা নিষেধ কারণ বিশ্বাস থাকে অন্তরে যা বাহির থেকে বুঝা সম্ভব নয়। কারো কাজ দেখে তার বিশ্বাস সম্পর্কে বুঝা সম্ভব নয়।

"……..খালিদ (রাঃ) বললেন, অনেক সলাত আদায়কারী এমন আছে যারা মুখে এমন এমন কথা উচ্চারণ করে যা তাদের অন্তরে নেই। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমাকে মানুষের দিল ছিদ্র করে, পেট ফেড়ে দেখার জন্য বলা হয়নি। ……..। (সাহিহ বুখারি ৪৩৫১)

উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর যুগে এক লোক যার নাম ছিল 'আবদুল্লাহ্ আর ডাকনাম ছিল হিমার। এ লোকটি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - কে হাসাত। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শরাব পান করার অপরাধে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হল। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে চাবুক মারার আদেশ দিলেন। তাকে চাবুক মারা হল। তখন দলের মাঝ থেকে এক লোক বলল, হে আল্লাহ্! তার উপর লা'নত বর্ষণ করুন! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাকে কতবার যে আনা হল! তখন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাকে লা'নত করো না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি যে, সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে ভালবাসে। (সাহিহ বুখারি ৬৭৮০)
সুতরাং বুঝা গেলো, ঈমান মানুষের অন্তরের বিষয় যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। বাহ্যিক কাজ দেখে কার ঈমান কেমন তা বুঝা সম্ভব নয়। তাই, একজন মুসলিমকে মুমিন বলে ডাকা যাবে না তাকে মুসলিম বলতে হবে।

যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহন করেছে সে হচ্ছে মুসলিম আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহনের সাথে সাথে ঈমানের বিষয়গুলোতে ঈমান এনেছে বা বিশ্বাস করেছে সে হচ্ছে মুমিন বা বিশ্বাসী।
যে ভূখণ্ডে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে মানবজাতির একটি অংশ থাকবে অর্থাৎ উক্ত ভূখণ্ডে (যেমন বাংলা অঞ্চলে) মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ থাকতে পারে। আল্লাহ কোরআনে কিছু আইন দিয়েছেন মানবজাতির সবার জন্য যেমনঃ চোরের হাত কাটার আইন। এই আইনটি এবং এ ধরণের আইন (অর্থাৎ শরিয়ার হাদ্দের আইন) খলিফা বা মুসলিম শাসক তার দায়িত্বাধীন ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠিত অঞ্চলের সবার প্রতি চালু করবেন। আল্লাহ কিছু আইন দিয়েছেন শুধু মুসলিমদের জন্য যেমন সালাত পড়া এবং যাকাত দেয়া। এই ধরণের আইন মুসলিম শাসক মুসলিমদের উপর প্রয়োগ করবেন এবং আদায় করে নিবেন। আল্লাহ কিছু আইন দিয়েছেন যারা বিশ্বাসী হতে চায় তাদের জন্য। যেমনঃ হিজাব করা। এই ধরণের আইনের ব্যাপারে মূল বা বিশুদ্ধ বা অকাট্য ইসলামী শরিয়াতে অর্থাৎ কোরআন, হাদিসে শাস্তির বিধান নেই। এগুলো যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এজন্য একজন ব্যক্তি আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহি করবেন। খলিফা বা মুসলিম শাসক এই ধরণের ব্যাপারে আইন বা শাস্তি দেয়ার বিধান করবেন না।
একজন খলিফা তার দায়িত্তপ্রাপ্ত ভূখণ্ডে কি কি আইন সবার জন্য প্রযোজ্য করবেনঃ
১) আল্লাহ এবং তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শাস্তি

১) চুরির শাস্তি

২) যিনাহ ব্যভিচারের শাস্তি

৩) হত্যার বদলে হত্যা বা রক্ত মূল্য

৪) হাইওয়েতে ডাকাতি

৫) মদপানের শাস্তি

৬) কিসাস অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান, নাকের বদলে নাক অর্থাৎ জখমের বদলে জখম।

৭) আরও কিছু কাজের জন্য শাস্তির বিধান কোরআন ও হাদিসে থাকতে পারে।

খলিফা বা মুসলিম শাসক মুসলিমদের থেকে কি কি আদায় করে নিবেন? কালিমা, সালাত (নামাজ) এবং যাকাত। সওম এবং হাজ্জ যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তি সওম এবং হাজ্জের জন্য আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহি করবেন। মুসলিম শাসক বা খলিফার বা মুসলিম সরকারের এই ব্যাপারে আইন করে, জোর করে কাউকে সওম রাখানোর বা হাজ্জ করানোর কোন দরকার বা দায়িত্ব নাই বা অধিকারও নাই।

শরিয়ার নামে বাড়াবাড়ি

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন,

আমাকে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যদি তারা তা করে, তবে তাদের রক্ত ও সম্পত্তি আমার পক্ষ থেকে সুরক্ষিত থাকবে তবে আইন দ্বারা ন্যায়সঙ্গত হওয়া ব্যতীত (অর্থাৎ কোরআনে এবং হাদিসে উল্লেখিত আল্লাহ এর নির্ধারিত আইন লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি পেতে হবে), **এবং তাদের বিষয়গুলি আল্লাহর উপর নির্ভর করে** (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাঃ শুধু কালিমা, সালাত, যাকাত – এই তিনটি বিষয়ের জবাবদিহিতা চাইবেন; আল্লাহ কালিমা, সালাত, যাকাত, সওম, হাজ্জ, হিজাব, ইত্যাদি সকল কিছুর হিসাব নিবেন)। (সাহিহ মুসলিম ২২)

আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল, এবং সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। যদি তারা তা করে, তাহলে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার পক্ষ থেকে সুরক্ষিত থাকবে, **যদি না**

(কোরআনের) আইন দ্বারা (তাদের রক্তপাত করার) ন্যায্যতা প্রমাণিত হয়, এবং তাদের (বাকি) ব্যাপার আল্লাহর হাতে। (সহীহ মুসলিম ২২)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় আরবের কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যায়। তখন 'উমর (রাঃ) [আবূ বকর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে] বললেন, আপনি (সে সব) লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন (যারা সম্পূর্ণ ধর্ম পরিত্যাগ করেনি, বরং যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে মাত্র)? অথচ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেনঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে, যে কেউ তা বললো, সে তার সম্পদ ও জীবন আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ করে নিলো। তবে ইসলামের বিধান (শরিয়া আইন) লঙ্ঘন করলে (শাস্তি দেয়া যাবে), **আর তার বাকি হিসাব-নিকাশ আল্লাহ নিবেন।** আবূ বক্‌র (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি যুদ্ধ করবো যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, কেননা যাকাত হল সম্পদের উপর আরোপিত হক। আল্লাহর কসম। যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো। 'উমর (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর কসম, আল্লাহ আবূ বকর (রাঃ)-এর হৃদয় বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তাঁর এ দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ। (সহীহ আল-বুখারী ১৩৯৯, ১৪০০)

সাহিহ বুখারি ১৩৯৯ এবং সাহিহ মুসলিম ২২ নাম্বার হাদিস থেকে এটা পরিষ্কার যে, একজন মুসলিম শাসক বা খলিফা তার ভূখণ্ডে থাকা মুসলিমদের শুধুমাত্র কালিমা, সালাত এবং যাকাতের ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকবেন। অর্থাৎ মুসলিমরা খলিফার কাছে বায়াত দেয়া ওয়াক্তসমূহের সালাত ঠিকভাবে পড়ছে কি না এবং যাকাত দিচ্ছে কি না - তা খলিফা নিশ্চিত করবেন। খলিফা সালাত কায়েম করবেন এবং যাকাত আদায় করবেন। অন্য সকল বিষয় মুসলিমরা করছে কি না - এই ব্যাপারে খলিফাকে আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। যেমনঃ সওম, হাজ্জ, হিজাব, ইত্যাদি। এই সব বিষয়ে ব্যক্তি আল্লাহ এর কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহি করবে।

সাহিহ বুখারি ১৩৯৯ এবং সাহিহ মুসলিম ২২ নাম্বার হাদিস থেকে এটাও পরিষ্কার যে, যদি কোন শাসক হিজাব না পড়ার কারণে কোন মেয়েকে শাস্তি দেন (জরিমানা বা জেল বা বেত্রাঘাত) তাহলে তিনি ঐ

মেয়ের উপর জুলুম করলেন। কারণ মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন যে যদি কেউ কালিমা পড়ে, সালাত পড়ে এবং যাকাত দেয় তাহলে সেই ব্যক্তির সম্পদ এবং জীবন নবীর (সাঃ) কাছ থেকে নিরাপদ থাকবে। আর ঐ ব্যক্তি ইসলামের বাকি বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহি করবেন। এখন হিজাব না পড়ার কারণে যদি কোন নারীকে জরিমানা, জেল, বেত্রাঘাত দেয়া হয় তাহলে তার জীবন ও সম্পদ তো কালিমা, নামাজ, যাকাতের ফরয আদায়ের পরও আপনাদের থেকে নিরাপদ থাকল না অথচ আল্লাহ এর রসূল সাঃ তাকে কথা দিয়েছিলেন যে, কালিমা, নামাজ, যাকাতের ফরয আদায় করলে তার জীবন এবং সম্পদ নবীর সাঃ থেকে সংরক্ষিত থাকবে। এখন আপনারা বলবেন যে, ঐ মহিলা হিজাব না করে ইসলামী শরিয়া ভঙ্গ করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। আপনারা কি ইসলামী শরিয়ার অকাট্য উৎস কোরআন বা হাদিস থেকে একটি হাদিস ও দেখাতে পারবেন যে, হিজাব না করার কারণে নবী (সাঃ) কাউকে জরিমানা বা শাস্তি দিয়েছেন অথবা জরিমানা বা শাস্তি দিতে বলেছেন? পারবেন না। আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী উনাদের কেউ কি হিজাব না করলে শাস্তি দিয়েছেন বা শাস্তি দিতে বলেছেন? হিজাব না পড়লে যে শাস্তি দেয়া হয় বা জরিমানা করা হয় তা শরিয়াতে নেই – এটা আপনারা বানিয়ে নিয়ে আসছেন। আল্লাহ এর রসূল সাঃ কথা দেয়ার পরও একজন নারী কালিমা, নামাজ, যাকাত আদায় করার পরও তার জীবন ও সম্পদ আপনাদের থেকে নিরাপদ থাকল না। এই জন্যই আল্লাহ ইসলামী শরিয়া আইন এই দেশে কবুল করেন না কারণ এরা তো ইসলামের দোহাই দিয়ে মানুষের উপর জুলুমের পাহাড় নিয়ে আসবে।

বাংলা অঞ্চলের মানুষের জন্য ইসলামী শরিয়ার আইনগুলো কেন আগেই লিখতে হবে এবং এই অঞ্চলের মানুষকে জানাতে হবে?

এখন আমাদের দেখতে হবে কিভাবে, বঙ্গ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় গ্রুপ যাকে এই বইয়ে "গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপ" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক ইসলামী শরিয়া বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করা যায়। আবার এদিকেও খেয়াল রাখতে হবে যে, এদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, দাবী পুরণ করতে গিয়ে যেন ইসলামী শরিয়ার নামে সমাজে শিরক, কুফর প্রতিষ্ঠিত না করা হয়। যেমনঃ গণতান্ত্রিক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করলে তাতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয় না। এতে সমাজে শিরক কুফরের মিশ্রণে বিকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়।

এখন আমরা দেখব, এই দেশে ইসলামী শরিয়ার আইনগুলো যদি আমরা সুন্দরভাবে লিখে মানুষের (মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধদের) সামনে বই আকারে উপস্থাপন করি তাহলে মানুষ তা গ্রহণ করে কি না? এরূপ করার কারণ হচ্ছে ইসলামী শরিয়ার কথা শুনলেই মানুষের না না প্রশ্ন জেগে উঠে, মানুষ অনেক কিছু ধারণা বা চিন্তা করে নেয়, যেমনঃ ইসলামী শরিয়া প্রতিষ্ঠিত হলে মেয়েদের কি জোর করে হিজাব পড়ানো হবে? মেয়েদের লেখাপড়ার কি হবে? নাটক, সিনেমা, গানের কি হবে? ব্যভিচার করলে কি রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে, ইত্যাদি। ইসলামী শরিয়া গ্রহনের দাওয়াত দেয়ার আগে আমরা ইসলামী শরিয়ার কি কি আইন বাস্তবায়ন করব এবং ইসলামী শরিয়া প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষকে কি কি আইন মেনে চলতে হবে তা আগে থেকেই মানুষকে জানাতে হবে যাতে মানুষের মনে অহেতুক ভয় বা বিভ্রান্তি না থাকে।

অর্থাৎ আমরা মানুষকে আগেই বলে দিচ্ছি যদি আমাদের মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামী শরিয়া এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করায় তাহলে আমরা ইসলামী শরিয়ার আইনগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করব বা তখন কি কি আইন থাকবে বা কি কি আইন মানুষকে মেনে চলতে হবে। মানুষের সামনে এই রকম একটি প্রস্তাব দেয়ার পর মানুষ ইসলামী শরিয়া চায় কি না - তা আমাদের দেখতে হবে অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাবে সাধারণ মানুষের মনোভাব বা response দেখতে হবে। এই প্রস্তাবটি বই আকারে প্রিন্ট করে দেয়া হবে, ইন্টারনেটে pdf আকারে দেয়া হবে, ইউটিউবে পড়ে শোনানো হবে, ফেসবুকে দেয়া হবে তারপর সাধারণ মানুষ ফেসবুকে ও অন্যান্য মাধ্যমে তাদের মতামত দিবে, কোন কিছু সংশোধন করতে হলে তা কোরআন হাদিস অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে। এভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষ ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ইসলামী শরিয়ার ভালো দিকগুলো বুঝতে পারবে। ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবে। এই ব্যাপারে খুবই সহনশীল হতে হবে। কেউ যদি ফেসবুকে বা সরাসরি এসে বলে যে, চোরের হাত কাটবেন – এটা তো মধ্যযুগীয় বর্বরতা - তাহলে তাকে কাফির বা মুশরিক বা মুরতাদ বলে গালি না দিয়ে তার সাথে আলোচনা করতে হবে। এ জন্যই বলা হয়েছে, যে অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে যাবেন সেখানের মানুষের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আগে ভালোভাবে বুঝে যেতে হবে। আপনাকে বুঝতে হবে বাংলা অঞ্চলে গত ৩০০ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল না ফলে তারা হাত কাটার কথা শুনলে আঁতকে উঠবে - এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি যদি তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কি কি শর্তে হাত কাঁটা হবে তাহলে তার ভয় অনেকটাই দুর হয়ে যাবে। চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কাঁটতে হলে অনেক শর্ত আছে, ইসলামী শরিয়া

মোতাবেক চোরের হাত কাঁটা এত সোজা না। **আমরা যে বঙ্গ অঞ্চলের লোকদের জন্য শরিয়া আইনগুলো কোরআন হাদিস থেকে খুঁজে বের করে লিখব সেক্ষেত্রে নবীর সাঃ নিম্ন লিখিত হাদিসগুলো মনে রাখতে হবেঃ**

আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল, এবং সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। যদি তারা তা করে, তাহলে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার পক্ষ থেকে সুরক্ষিত থাকবে, যদি না (কোরআনের) আইন দ্বারা (তাদের রক্তপাত করার) ন্যায্যতা প্রমাণিত হয়, এবং তাদের (বাকি) ব্যাপার আল্লাহর হাতে। (সহীহ মুসলিম ২২)

আবু মাসউদ আল-আনসারী থেকে বর্ণিত

একবার এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি মনে হয় (ফরজ) নামাযে (জামাতে) উপস্থিত হতে পারব না কারণ অমুক (ইমাম) যখন আমাদের ইমামতি করেন তখন নামায দীর্ঘায়িত করেন।" বর্ণনাকারী আরও বলেন: "আমি নবীকে (সাঃ) উপদেশ দেয়ার সময় এত রাগান্বিত হতে অন্য কখনো দেখিনি। নবী (সাঃ) বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমাদের কেউ কেউ অন্যদের কাছে ভালো কাজকে অপছন্দনীয় করে তুলছে। সুতরাং, যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করে সে যেন নামায সংক্ষিপ্ত করে কারণ তাদের মধ্যে থাকে অসুস্থ, দুর্বল এবং অভাবী (যার জীবিকার জন্য কাজের তাড়া) ।" (সাহিহ বুখারি, খণ্ড ১, বই ৩, সংখ্যা ৭৩)

আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত

নবী (সাঃ) বলেছেন, "মানুষের জন্য (ধর্মীয় বিষয়াদি) সহজ করো, তাদের জন্য কঠিন করো না এবং তাদের সুসংবাদ দাও এবং তাদের (ইসলাম থেকে) পালিয়ে যেতে বাধ্য করো না।" (সাহিহ বুখারি, খণ্ড ১, বই ৩, সংখ্যা ৬৯)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

যখনই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে দুটি কাজের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হত, তখন তিনি দুটির মধ্যে সহজটি বেছে নিতেন, যতক্ষণ না তা করা পাপ ছিল। কিন্তু যদি তা করা পাপ হত, তাহলে তিনি এর কাছে যেতেন না। (সহীহ আল-বুখারী ৩৫৬০)

অর্থাৎ বাংলা অঞ্চলের মানুষের জন্য শরিয়ার আইনগুলো যত সহজ করা যায় তত সহজ করতে হবে যতক্ষণ না তা হারাম হয়ে যায়। শরিয়া আইনগুলো লিখতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে, শরিয়া কি?

ইসলামী শরিয়া ও ফিকহ কি?

পরিপূর্ণ বিশুদ্ধভাবে বললে ইসলামী শরিয়া হচ্ছে, কোরআন এবং হাদিস। প্রাথমিকভাবে এবং অকাট্য শরিয়া হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস। শরিয়ার অন্য দু'টি উৎস হচ্ছেঃ কিয়াস এবং ইজমা। কিন্তু এই দুটিকে শরিয়ার অকাট্য দলিল বা উৎস হিসেবে গ্রহন করা যায় না। কারণ এই দুটি উৎসই আলেমদের/মানুষের ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কিত। যদি তাদের ব্যাখ্যা ভুল হয় তাহলে তা শরিয়ার অংশ হবে না। তাহলে, শরিয়ার বিশুদ্ধ মূল উৎস দু'টিঃ কোরআন এবং হাদিস এবং এই দু'টি উৎসই হচ্ছে অকাট্য উৎস বা দলিল।

কোরআন, হাদিস থেকে বিভিন্ন সময় মুসলিম আলেম, ওলামারা যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের এবং আমলের যে নিয়ম -কানুন বের করেছেন তাকে বলা হয় ফিকহ। যেমনঃ সালাত (নামায) কিভাবে পড়তে হবে, সওম কিভাবে রাখতে হবে? সালাতে ফরয, সুন্নত, ওয়াজিব কি কি? ইত্যাদি। বর্তমানে মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন ধরণের ফিকহের প্রচলন আছে। সহজ ভাষায় বললে ফিকহকে আমাদের দেশে মাজহাব নামে সবাই চিনে। যেমনঃ হানাফি ফিকহ (মাজহাব) , শাফি ফিকহ (মাজহাব),হাম্বলি ফিকহ (মাজহাব), মালেকি ফিকহ (মাজহাব) , ইত্যাদি।

শরিয়া এবং ফিকহের মধ্যে পার্থক্য কি?

শরিয়া অপরিবর্তনীয়। প্রত্যেক মুসলিম শরিয়া মানতে বাধ্য। কিন্তু একজন মুসলিম ফিকহ মানতে বাধ্য নয় কারণ ফিকহ হচ্ছে আলেম, ওলামা কর্তৃক কোরআন, হাদিসের ব্যাখ্যা। একজন মুসলিম যদি প্রচলিত ফিকহ না মানে তাহলে সে কি মুসলিম থাকবে? হ্যাঁ, মুসলিম থাকবে তবে এই ক্ষেত্রে তাকে নিজে কোরআন, হাদিস পড়ে পড়ে কোরআন হাদিস অনুযায়ী বিশ্বাস ও আমল করতে হবে।

এখন আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে শরিয়ার সাথে ফিকহের পার্থক্য দেখব। আপনারা কেউ কেউ হয়তো জানেন যে, ইসলামে মেয়েদের মুসলমানি বা খৎনা করার একটি বিষয় আছে। একে ইংলিশে Female genital mutilation (FGM) বা female circumcision বলা হয়।

উম্মে আতিয়্যা আল-আনসারিয়া থেকে বর্ণিত:

মদিনাতে এক মহিলা খৎনা করতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: “কঠোরভাবে (গভীরভাবে) কেটো না, কারণ এটা নারীর জন্য ভালো এবং স্বামীর জন্য বেশি কাম্য।”

আবু দাউদ বলেন: এটি ‘উবাইদুল্লাহ বিন আমর কর্তৃক আব্দুল মালিক থেকে ভিন্ন সনদের মাধ্যমে একইভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আবু দাউদ বলেন: এটি শক্তিশালী হাদীস নয়। এটি মুরসাল আকারে বর্ণিত হয়েছে (সাহাবীদের সম্পর্ক অনুপস্থিত)

আবু দাউদ বলেন: মুহাম্মদ বিন হাসান অস্পষ্ট, এবং এই হাদীসটি দুর্বল।

(সুনান আবি দাউদ ৫২৭১; হাদিসের গ্রেডঃ আলবানীর মতে সাহিহ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন:

"যখন খৎনাকৃত ব্যক্তি খৎনাকৃত ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, তখন অবশ্যই গোসল করা ফরজ। আমি এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তা করেছি, তাই আমরা গোসল করেছি।" জামে আত-তিরমিযী ১০৮ সহীহ (দারুস সালাম); সুনান ইবনে মাজাহঃ ৬০৮)

ইয়াহিয়া আমার কাছে মালিক, নাফি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলতেন, "যখন খৎনাকৃত অংশ খৎনাকৃত অংশ অতিক্রম করে যায়, তখন গোসল ফরজ হয়।" (মুয়াত্তা মালিক,বই ২, হাদিস ৭৭)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীর চার হাত ও পায়ের মাঝখানে বসে এবং দুটি খৎনাকৃত অংশ মিলিত হয়, তখন গোসল করা ফরজ।” (সহীহ মুসলিম ৩৪৯)

এছাড়া আরও কিছু হাদিস মেয়েদের খৎনা / মুসলমানী করার বিষয়ে আছে। কিন্তু কোন হাদিস থেকেই সরাসরি এটা প্রমাণিত হয় না যে, মেয়েদের খৎনা করা ফরয বা ওয়াজিব। যে কেউ উপরের হাদিসগুলো পড়লে বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) সময় মেয়েদের খৎনা করার বিষয়টি আরব অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং অনেক মহিলা সাহাবী খৎনা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) মেয়েদের খৎনা বা মুসলমানি করতে নির্দেশ দিয়েছেন – এমন কোন হাদিস পাওয়া যায় নি। তাহলে, আমি, আপনি সাধারণ জ্ঞান দিয়েই বুঝতে পারি যে, ইসলামে মেয়েদের খৎনা করা যার যার ব্যাক্তিগত ব্যাপার। যার ইচ্ছা করবে, যার ইচ্ছা করবে না। এখন হানাফি, হাম্বলি, মালেকি মাজহাবে

বা ফিকহে মেয়েদের খৎনা বা মুসলমানি করাকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। অর্থাৎ করলে নেকী পাবেন আর না করলে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু শাফি মাজহাবে বা ফিকহে মেয়েদের মুসলমানি বা খৎনা করাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে অর্থাৎ অবশ্যই করতে হবে। এখন কেউ যদি শরিয়া আইনের কথা বলে শাফি মাজহাবের বা ফিকহের শরিয়ার ব্যাখ্যা আমাদের দেশের মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয় এবং মেয়েদের মুসলমানি বা খৎনা করাকে ওয়াজিব হিসেবে ঘোষণা করে তাহলে কেউ কি তা মানবে? ৯৯% মুসলিম মেয়েরা এবং মেয়েদের বাবারা বলবে, "দরকার নাই আমার শরিয়া আইন, আমরা যেমন আছি তেমন-ই ভালো আছি, শরিয়া আইন দরকার নাই, আল্লাহ আমাদের যা করার করবে, আমরা আমাদের মেয়েদের মুসলমানি / খৎনা করতে পারব না"। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শরিয়ার (কোরআন ও হাদিসে) কোথাও কিন্তু মেয়েদের খৎনা বা মুসলমানি করতে বলা হয়নি বা নির্দেশ দেয়া হয়নি। শাফি ফিকহে (মাজহাবে) শরিয়ার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, মেয়েদের খৎনা বা মুসলমানি করা ওয়াজিব বা অবশ্যই করনীয়। তাহলে, যদি কোন মেয়ে বা মেয়ের পিতা মেয়েকে খৎনা করতে অস্বীকার করে তাহলে সে শরিয়ার শাফি ফিকহের ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করছে - সে কোন ভাবেই শরিয়াকে অস্বীকার করছে না কিন্তু আমাদের দেশের বেশিরভাগ মুসলিম শরিয়া এবং ফিকহের পার্থক্য না বুঝেই সরাসরি শরিয়াকে অস্বীকার করে বসে এবং না বুঝেই গুনাহে পড়ে যায়। তবে তাদের চেয়ে সেই সব "আলেমদের”, লোকদের বা দলের বেশি গুনাহ হয় যারা শরিয়ার হানাফি ফিকহের (মাজহাবের) ব্যাখ্যাকে বা শাফি ফিকহের ব্যাখ্যাকে বা হাম্বলি ফিকহের ব্যাখ্যাকে বা মালেকি ফিকহের ব্যাখ্যাকে সরাসরি শরিয়া বলে চালিয়ে দেয়। তাহলে, ঐ সকল মেয়ে এবং মেয়েদের পিতার কি বলা উচিত ছিল? তাদের বলা উচিত ছিল যে, “আমরা শরিয়া আইন মানি কিন্তু তোমরা শরিয়ার যে ব্যাখ্যা (শাফি ফিকহের ব্যাখ্যা) আমাদের কাছে নিয়ে এসেছ তা ভুল, তাই আমরা তোমাদের শরিয়ার ব্যাখ্যা মোতাবেক মেয়েদের খৎনা / মুসলমানি করাব না"।

এখন আলেমরা তর্ক শুরু করবে যে, "আপনি জানেন ইমাম শাফি কত বড় আলেম ছিলেন? ইমাম শাফির ভুল ধরার আপনি কে? ঈমান নষ্ট হয়ে কাফির হয়ে মরবেন, ইত্যাদি। উত্তরে আপনি বলবেন, "আমিতো ইমাম শাফির উপর ঈমান আনি নাই, আল্লাহ আমাকে সেটা করতে বলেও নাই, আমি ঈমান এনেছি মুহাম্মাদ সাঃ এর উপর। আপনি (আলেম সাহেব) পারলে নবীর (সাঃ) কোন সাহিহ বা হাসান হাদিস আমাকে দেখান যেখানে, মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন যে, মেয়েদের অবশ্যই খৎনা করতে হবে বা মেয়েদের খৎনা না করলে জাহান্নামে যেতে হবে"। এই রূপ হাদিস নাই, সুতরাং আলেম সাহেব এই রকম হাদিস দেখাতে পারবে না। তবে তারা এই কথা বলে যে,

“যে যেই মাজহাব মানবে তাকে সেই মাজহাবের সকল আইন, কানুন মানতে হবে, আপনি যেহেতু শাফি মাজহাব (ফিকহ) মানেন , তাই আপনাকে শাফি ফিকহের সকল নিয়ম মানতে হবে" (***)। তখন আপনি বলবেন, "আজব ব্যাপার ! আমিতো নবীর সাঃ অনুসারী। আমিতো ইমাম শাফির অনুসারী না - যে উনার সব হাদিসের ব্যাখ্যা আমি গ্রহন করব। ইমাম শাফি হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা দিলে আমার কি করার আছে? তার চেয়ে বড় কথা আমি ইমাম শাফির কথা বা ব্যাখ্যা মানতে যাবো কেন ? আমিতো নবীর (সাঃ) কথা মানব।

(*** যে যেই মাজহাব বা ফিকহ মানে তাকে সেই মাজহাবের বা ফিকহের সকল নিয়ম মানতে হবে - এটা একটা মারাত্মক ভুল কথা; আমরা কোরআন, হাদিস নিজেরা পড়ব তারপর নিজেরা কোরআন হাদিস পড়ে কি বুঝলাম তার সাথে উক্ত বিষয়ে ইমাম হানাফি, শাফি, হাম্বলি, ইমাম মালেক এবং অন্যান্য আলেমরা কি বুঝেছেন, তারা কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেটা জানব, তারপর আমার কাছে যে ব্যাখ্যাটা সঠিক মনে হয় সেটা আমি গ্রহন করব, আমি অবশ্যই হানাফি বা শাফির মতামত গ্রহন করবো না, আমি তাদের কাছে শিখব যে কিভাবে কোরআনের আয়াত এবং হাদিস ব্যাখ্যা করতে হয়, তারা কিভাবে কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন, তারপর আমি কোরআন হাদিস পড়ে সঠিক আইনটা গ্রহন করব। যেমনঃ মেয়েদের খৎনা করার ব্যাপারে হাদিস পড়ার পর আমি চিন্তা করেছিলাম যে, এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার, যার ইচ্ছা করবে, যার ইচ্ছা করবে না; এই ব্যাপারটি ইসলামে ফরয বা ওয়াজিব হবে না। তারপর আমি সকল ইমামের উক্ত বিষয়ে মতামত দেখে বুঝলাম যে, উক্ত বিষয়ে ইমাম শাফির মতামত ভুল অন্যদিকে ইমাম হাম্বলি, হানাফি, ইমাম মালেকের মতামতের সাথে আমার চিন্তার মিল খুঁজে পেলাম ফলে বুঝতে পারলাম যে উক্ত বিষয়ে সঠিক নিয়ম কোনটি হবে। এখানে আমি কোন আলেমের মতামত গ্রহন করিনি, আমি তাদের সাথে আমার মতামত বা চিন্তাকে মিলিয়ে দেখেছি যে আমার চিন্তা ঠিক আছে কি না। এটাই হচ্ছে ইসলাম মেনে চলার সঠিক নিয়ম) আমার কথার পক্ষে প্রমান নিম্নরূপঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত

আমি বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ভাগ্যবান ব্যাক্তি যে কেয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভ করবে?" আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন: হে আবু হুরায়রা! "আমি চিন্তা করেছিলাম যে, আপনার আগে কেউ এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কারণ হাদিস শেখার জন্য আপনার প্রবল আকাঙক্ষা সম্পর্কে আমি জানি। কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভকারী সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি হবে সেই ব্যক্তি যে আন্তরিকভাবে হৃদয়ের গভীর থেকে বলেছে "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"

আর 'ওমর বিন আব্দুল আজিজ - আবু বকর বিন হাজমকে লিখেছিলেন, "হাদিসের জ্ঞান অনুসন্ধান করো এবং তা লিখে নাও, কারণ আমি ভয় করি যে ধর্মীয় জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় জ্ঞানীরা মারা যাবে (মৃত্যুবরণ করবে)। **নবীর হাদিস ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করো না।** জ্ঞান প্রচার করো এবং অজ্ঞদের শিক্ষা দাও, কারণ জ্ঞান গোপনে (নিজের কাছে) রাখা ছাড়া হারিয়ে যায় না।" (সাহিহ বুখারি, খণ্ড ১, বই ৩, সংখ্যা ৯৮)

ওমর বিন আব্দুল আজিজ কে ছিলেন? তিনি ছিলেন একজন উমাইয়া খলিফা যাকে অনেক সুন্নি আলেমরা সম্মান করে দ্বিতীয় ওমর (Umar al-Thani) নামে অভিহিত করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ওমর বিন আব্দুল আজিজ খলিফা হবার পর পূর্বের উমাইয়া খলিফাদের সময় মসজিদে জুমার খুতবায় আলীকে (রাঃ) অভিশাপ দেয়ার যে রীতি ছিল তা বন্ধ করেন। এখান থেকেই বুঝা যায় যে,ওমর বিন আব্দুল আজিজ একজন জ্ঞানী মুসলিম ছিলেন। হাদিসে তিনি আবু বকর বিন হাজমকে কি লিখেছিলেন , " **নবীর হাদিস ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করো না।"**
তাহলে, আমরা আজকে যে অন্ধভাবে হাদিস না জেনেই আলেমদের কাছ থেকে ওজুর নিয়ম, পর্দার নিয়ম শিখছি, ইসলামী শরিয়া আইন শিখছি - তা কি ঠিক?

মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের হাদিস পড়ে - আমি যা বুঝেছি তা - প্রচার করতে বলেছেন না তিনি তার কথা অর্থাৎ হাদিস প্রচার করতে বলেছেন?
"আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত (কথা) হলেও তা পৌঁছে দাও। বনী ইসরাঈলের পক্ষ থেকেও বর্ণনা করো, কারণ এতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা বলে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান তৈরি করে নেয়।" (সহীহ আল-বুখারী ৩৪৬১)
আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছেন,"………… আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেইনি? তারা বলল, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকো। অতএব, যারা উপস্থিত আছেন তাদের উপর (আমার এই কথাগুলো) অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য, **কারণ যার কাছে পৌঁছে দেয়া হবে সেই ব্যক্তি (আমি যা বলেছি) তা উপস্থিত শ্রোতাদের চেয়ে বেশি ভালো বুঝতে পারে এবং যারা তাকে তা পৌঁছে দেবে (তাদের চেয়ে নবীর (সাঃ) কথা বেশি ভালো বুঝতে পারে) ।** সাবধান! আমার পরে একে অপরের ঘাড় কেটে (গলা কেটে) কাফের হয়ে যেও না।" (সহীহ আল-বুখারী ১৭৪১)

কোথাও কি এমন কোন হাদিস পেয়েছেন যে, যেখানে আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, " আমার কথা শুনে - তুমি যা বুঝেছ তা - অন্যদের কাছে পৌঁছে দিও"। এই রকম হাদিস কোথাও নেই। আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) বানী প্রচার সম্পর্কিত যত হাদিস আমি পেয়েছি তার কোথাও আমি এই রকম কথা পাইনি যে, নবীর সাঃ কথা তুমি যা বুঝেছ তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে নবী (সাঃ) কাউকে বলেছেন। নবীর (সাঃ) প্রচুর হাদিস এই ব্যাপারে আছে যেখানে তিনি তার কথা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন। সাহাবীরা এই কাজটিই করতেন। আপনি এমন প্রচুর হাদিস পাবেন যেখানে কোন সাহাবী কোন ক্ষেত্রে কোন কিছু বলেছেন এবং সাথে সাথে তিনি তার কথার পক্ষে হাদিস বলেছেন। আমি এমন কখনো পাইনি যে, কোন সাহাবী কোন কিছু কাউকে করতে বলেছেন বা কোন ক্ষেত্রে কোন নিয়ম বলেছেন কিন্তু তিনি সেই সম্পর্কিত হাদিস বলেন নি। সাহাবীরা হাদিস প্রচার করতেন – উনারা হাদিস পড়ে নিজেরা কি বুঝেছেন – সেটা প্রচার করতেন না। সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) সাহাবীদের বিদায় হাজ্জের ভাষণে কি বলেছেন সেটাই আমরা দেখতে চাই, বুঝতে চাই। বিদায় হাজ্জের ভাষণে আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, উপস্থিত সাহাবীরা যেন যারা সেখানে উপস্থিত নেই তাদের কাছে নবীর সাঃ কথাগুলো পৌঁছে দেন। এটা এমন হতে পারে যে, উপস্থিত সাহাবীরা নবীর (সাঃ) কথা যতটুকু বুঝবেন তার চেয়ে যার কাছে উনারা নবীর কথা পৌঁছে দেবেন তারা নবীর সাঃ কথা উপস্থিত সাহাবীদের চেয়ে বেশি ভালো বুঝতে পারেন। এটা এমন হতে পারে যে, যে হাদিস অন্য কারো কাছে পৌঁছে দিয়েছে তার চেয়ে যার কাছে হাদিস পৌঁছে দেয়া হয়েছে সে সেই হাদিসটি বেশি ভালো বুঝতে পারে। ইমাম বুখারি আমাদের কাছে অনেক হাদিস পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ উনাকে উত্তম প্রতিদান দেক। সহীহ আল-বুখারী ১৭৪১ হাদিস থেকে আমরা এই কথা বলতে পারি যে, এমন সম্ভাবনা আছে যে, আমাদের জমানার কোন মুসলিম ইমাম বুখারি থেকে প্রাপ্ত হাদিস ইমাম বুখারির চেয়ে বেশি ভালো বুঝতে পারে। এজন্য হাদিস পড়ে নিয়ম কানুন বের করে তারপর হাদিস ছাড়াই নিয়ম কানুন প্রচার করা হচ্ছে ভুল কাজ বরং হাদিসটি মানুষের কাছে প্রচার করা হচ্ছে সঠিক কাজ।

আমি বর্তমান জমানার সকল মুসলিমদের অনুরোধ করব যে, কোরআন, হাদিস ছাড়া কোন কিছু গ্রহন করবেন না। ওমর বিন আব্দুল আজিজ সঠিক উপদেশ দিয়েছেন যে, "হাদিস ছাড়া কোন কিছু গ্রহন করো না"।

আমাদের দেশে তৌহীদি জনতা নামে নতুন এক ফিতনা বা পথভ্রষ্ট দল এসেছে। তারা রাস্তা - ঘাটে মেয়েদের পোশাক নিয়ে অপমান করে। মেয়েরা প্রকাশ্যে ধূমপান করলে সেটা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে কিন্তু ছেলেরা প্রকাশ্যে ধূমপান করলে বিলাইয়ের মত চুপচাপ বসে থাকে। ইসলামে কি এমন কোন

নিয়ম আছে যে, ছেলেরা প্রকাশ্য ধুমপান করলে গুনাহ কম হবে আর মেয়েরা প্রকাশ্য ধূমপান করলে গুনাহ বেশি হবে ? তোমরা সামাজিকভাবে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য করো কিন্তু ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে মেয়েদের প্রতি বিদ্বেষমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণ করলে তোমাদের যে আরও বেশি গুনাহ হয় – সেটা তো তোমরা জানো না। এই সব আচরণের কারণে মেয়েরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। মেয়েদের জন্য মসজিদে নামাজের জায়গা রাখো না। জুম্মার নামাযটাও মেয়েরা মসজিদে গিয়ে পড়তে পারে না। মেয়েদের জন্য মসজিদে নামাজের জায়গা রাখার কথা বললে - বলা হয়, মসজিদে জায়গা নেই (অথচ মাগরিবের নামাজেও ৫ তলা মসজিদের ২য় তলাই ভরে না) , মসজিদের পরিবেশ নষ্ট হবে, মসজিদে ফিতনা হবে - আরও কত কথা। এভাবে আপনারা মেয়েদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। মেয়েদের জন্য এমন কি ঈদের নামাজ পড়ার সুযোগটা পর্যন্ত রাখে না - এই সকল মসজিদ কমিটি এবং তাদের আলেম – ইমামরা।

যাই হোক, এখন আমরা দেখব, ইসলামে একজন মুসলিম শাসকের উপর বা খলিফার উপর কি কি বিষয় ফরজ?

কোরআন, হাদিসের উপর ভিত্তি করে আমরা দেখতে পাই যে, একজন মুসলিম শাসকের বা খলিফার উপর ফরজ হচ্ছে ইসলামী শরিয়া আইন বাস্তবায়ন করা অর্থাৎ কোরআন, হাদিসে যে সকল আইন কানুন বিধি-বিধান পাওয়া যায় তা বাস্তবায়ন করা। এই ক্ষেত্রে শাসক বা খলিফার নিজের থেকে কোন আইন দেয়ার অধিকার নেই। তবে প্রয়োজন হিসেবে দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য কিছু ক্ষেত্রে তিনি কোরআন, হাদিসে পাওয়া আইন -কানুনের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন কিছু নিয়ম করতে পারবেন। তিনি এমন কোন কঠোর নিয়ম করবেন না - যাতে মানুষ ইসলাম ছেড়ে দূরে সরে যায়।

ইসলামি শরিয়া আইন যে ভূখণ্ডে থাকবে সেই ভূখণ্ডে ২ ধরণের লোক থাকবে। যথাঃ

১) মুসলিমঃ মুসলিমদের মধ্যে আবার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে অনেক রকম লোক থাকবে। যথাঃ শক্তিশালী ঈমানের / বিশ্বাসের অধিকারী, দুর্বল ঈমানের / বিশ্বাসের অধিকারী।

২) অমুসলিমঃ অমুসলিমদের মধ্যে অনেক ধর্মের লোক থাকবে। যেমনঃ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, শিখ, ইত্যাদি।

এরা প্রায় সবাই ইসলামী শরিয়া আইনকে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়ে এই ভূখণ্ডে বসবাস করবে। অমুসলিমরাও ইসলামী শরিয়া আইন মেনে নিয়েই এই ভূখণ্ডে বসবাস করবে। অর্থাৎ ইসলামকে তারা রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহন করেই এই ভূখণ্ডে বসবাস করবে কারণ ইসলামী শাসন ব্যবস্থায়

মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য ফৌজদারি আইন একই। তাহলে, ইসলামের এই অংশটি কিন্তু অমুসলিমরাও গ্রহন করছে। আর একজন মুসলিম খলিফার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী শরিয়া আইনের ফৌজদারি অংশটুকু সম্পূর্ণভাবে এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।

ইসলামে এমন কিছু আইন আছে যার জন্য ব্যাক্তি নিজে আল্লাহ এর কাছে দায়িত্বশীল এবং এজন্য ব্যাক্তিকেই আল্লাহ কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করবেন – এই ব্যাপারে মুসলিম শাসকের কিছু করার নেই। যেমনঃ দাড়ি রাখা বা না রাখা। কোরআনে বা হাদিসে দাড়ি না রাখলে দুনিয়াতে দাড়ি না রাখার জন্য কোন শাস্তির কথা বলা হয়নি তাই কেউ যদি দাড়ি না রাখে তাহলে এটা তার ব্যাক্তিগত ব্যাপার – খলিফা তাকে এই ব্যাপারে জোর করতে পারবেন না বা শাস্তির বিধান তৈরি করতে পারবেন না। এই ব্যাপারে উক্ত ব্যাক্তি আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহি করবেন – এটা তার এবং আল্লাহ এর মধ্যকার ব্যাপার, এখানে মুসলিম শাসক বা খলিফার আইন করে শাস্তি দেয়ার অধিকার নেই। এখন আমরা কিছু বিষয়ে ইসলামী শরিয়ার আইন কানুন নিয়ে আলোচনা করব।

পর্দার / হিজাবের বিধানে খলিফা বা মুসলিম শাসকের করণীয়ঃ

"হে আদাম সন্তান! আমি তোমাদেরকে পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়েছি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এবং শোভা বর্ধনের জন্য। আর তাকওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম পোশাক। ওটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে"। (সূরা আল আরাফঃ ২৬)

"মু'মিনদের / বিশ্বাসীদের বল তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র, তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালভাবেই অবগত"। (সূরা নুরঃ ৩০)

"আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা সৌন্দর্য (adornment) প্রকাশ না করতে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই-এর ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন কৃতদাস-কৃতদাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা সৌন্দর্য (adornment) প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের

গোপন শোভা- সৌন্দর্য (adornment) প্রকাশের উদ্দেশে সজোরে পদক্ষেপ না ফেলে।। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"। (সূরা নুরঃ ৩১)

আর বৃদ্ধা নারী, যারা বিয়ের আশা রাখেনা, তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য (adornment) প্রদর্শন না করে তাদের বাহিরের পোশাক (outer garments) খুলে রাখে; তবে এটা হতে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা নুরঃ৬০)

তোমরা যারা ঈমান এনেছ শোন! নবীগৃহে প্রবেশ কর না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় খাদ্য গ্রহণের জন্য, (আগেভাগেই এসে পড় না) খাদ্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করে যেন বসে থাকতে না হয়। তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ কর। অতঃপর তোমাদের খাওয়া হলে তোমরা চলে যাও। কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। তোমাদের এ কাজ নবীকে কষ্ট দেয়। সে তোমাদেরকে (উঠে যাওয়ার জন্য বলতে) লজ্জাবোধ করে, আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা যখন তার স্ত্রীগণের নিকট কোন কিছু চাও, তখন পর্দার আড়াল হতে তাদের কাছে চাও। এটাই তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতর। তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া সঙ্গত নয়। আর তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীগণকে বিয়ে করাও তোমাদের জন্য কক্ষনো বৈধ নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা মহা অপরাধ। (সূরা আহযাবঃ ৫৩)

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, তোমার কন্যাদেরকে আর মু'মিনদের নারীদেরকে বলে দাও- তারা যেন তাদের চাদরের (outer garments) কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয় (যখন তারা বাড়ীর বাইরে যায়), এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আহযাবঃ ৫৯)

এছাড়া হিজাব বা পর্দা নিয়ে কোরআনে অন্য কোনো আয়াত আছে বলে আমার জানা নেই। হিজাব নিয়ে অনেক হাদিস আছে। কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা করে একেকজন মুহাদ্দিস পুরুষ এবং নারীর কতটুকু পর্দা করতে হবে সেটা নিয়ে একেক রকম মতামত দিয়েছেন। এই বিষয়ে আমি আলোচনা করতে যাবো না। আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে একজন মুসলিম শাসক বা খলিফা নারীদেরকে পর্দা করতে বাধ্য করতে পারেন কি না? হিজাব না করলে কোরআনে বা হাদিসে দুনিয়ায় কোন শাস্তির বিধান কোরআনে বা হাদিসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই, কেউ যদি হিজাব না করে রাস্তায় বের হয় যার হাত, চুল, কাধ দেখা যাচ্ছে বা যে নারী বাহিরের চাদর বা উরনা পড়েনি তাকে খলিফা কি শাস্তি বা জরিমানা করতে পারেন?

বিশুদ্ধ শরিয়া বা শরিয়ার প্রধান ২ টি উৎস অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী পারেন না কারণ হিজাব না পড়ার কারণে বা ছেলেরা মেয়েদের পোশাক বা মেয়েরা ছেলেদের পোশাক পড়ার কারণে কোরআন এবং হাদিসে দুনিয়ায় কোন শাস্তির বিধানের কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ বিশুদ্ধ শরিয়া বা শরিয়ার প্রধান ২ টি উৎস অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী কে কি পোশাক পড়বে সেটা তার এবং তার রবের মধ্যেকার ব্যাপার। প্রত্যেকে তার পর্দা করা বা না করার কারণে আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহি করবে - এই ব্যাপারে মুসলিম খলিফা বা শাসকের কিছুই করার নেই।

তাহলে, হিজাব না করলে ইরান এবং আফগানিস্থানে যে মেয়েদের শাস্তি দেয়া হয়? তারা এটা আলেমদের ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ ফিকহের উপর ভিত্তি করে দেয়।
"আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কার্য হতে নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে"। (সূরা আহযাবঃ ৪১)
"যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না"। (সূরা নূরঃ ১৯)

কোরআনের এই আয়াত ২ টির উপর ভিত্তি করে অনেক মুস্তাহিদ মতামত দিয়েছেন যে, হিজাব না করলে জরিমানা করা যাবে বা শাস্তি দেয়া যাবে। তাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে অনেক দেশে হিজাব না করলে বা পরিপূর্ণভাবে না করলে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। যেমনঃ ইরান, আফগানিস্থান। তাদের যুক্তি হচ্ছে, হিজাব ছাড়া মেয়েরা রাস্তায় বের হলে সমাজে পতিতাবৃত্তি, পরকীয়া, যিনাহ, ব্যভিচার বেড়ে যাবে, ইত্যাদি।
তাদের প্রতি আমার প্রশ্নঃ আপনারা (আলেম,মুহাদ্দিস, ইত্যাদি) আজকে বলছেন যে, হিজাব না করে কোন মেয়ে বা মেয়েরা রাস্তায় বের হলে যিনাহ, ব্যভিচার বেড়ে যাবে - কিন্তু আল্লাহ তো অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছু জানেন – তিনি তো উনার নবীর (সাঃ) কাছে কোন আইন ১৪০০ বছর আগে পাঠান নাই যে, হিজাব না করে বা পরিপূর্ণ হিজাব না করে কেউ রাস্তায় বের হলে তাকে শাস্তি দিবেন বা জরিমানা করবেন? এখন হিজাবের ব্যাপারে আপনারা "সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ" কিভাবে করতে হবে সেটা নবীর (সাঃ) চেয়ে বেশি বুঝে গেছেন? যেখানে নবী (সাঃ) এই ব্যাপারে দুনিয়ায় কোন শাস্তির বিধানের কথা বলেন নাই – অথচ আপনারা শাস্তির বিধান (জরিমানা / জেল)

নিজেরা বানিয়ে নিয়ে আসছেন। যিনাহ কিভাবে বন্ধ করতে হবে - সেই কথা কি আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) বলেন নাই?

আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আমরা কতক যুবক ছিলাম; আর আমাদের সম্পদ তেমন কিছু ছিল না। এই অবস্থায় আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে এবং যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম পালন করে। কেননা, সওম তার যৌনশক্তিকে দমন করবে। (সাহিহ বুখারিঃ ৫০৬৬)

এখন আপনারা কি এই হাদিসের উপর এবং সূরা আহযাবের ৪১ নাম্বার আয়াতের উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিবেন যে, মুসলিম শাসক বা খলিফা যে সকল যুবক ছেলেরা বিয়ে করে না তারা যদি সওম না রাখে তাহলে তাদেরকে জরিমানা করবে বা জেল দিবে ?

সূরা নূরের ৩০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ প্রথমেই বলেছেন দৃষ্টি অবনত বা সংযত করতে। তাহলে আপনারা সূরা নূরের ৩০ নাম্বার এবং সূরা আহযাবের ৪১ নাম্বার আয়াতের উপর ভিত্তি করে এই ফতোয়া কি দিবেন যে, খিলাফত রাষ্ট্রে পুলিশ রাস্তায় দাড়িয়ে থাকবে তারপর কোন ছেলে যদি কোন মেয়ের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাহলে তাকে জেল, জরিমানা করতে হবে ?

আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) সময়ও অন্তত একজন মুসলিম মেয়ে নিজেকে প্রদর্শন করত অর্থাৎ ঠিকমত পর্দা বা হিজাব করত না। হাদিসে প্রমান আছে ; কিন্তু আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) কি এজন্য তাকে কোন শাস্তি দিয়েছিলেন ?

কাসিম বিন মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"ইবনে আব্বাস দুই ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যারা লি'আন প্রক্রিয়ায় লিপ্ত ছিলেন। ইবনে শাদ্দাদ তাকে বললেন: 'এ কি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "আমি যদি প্রমাণ ছাড়াই কাউকে পাথর মারতাম, তাহলে আমি অমুককে পাথর মারতাম।" ইবনে আব্বাস বললেন: 'না, সে ছিল একজন মহিলা, (যদিও সে একজন মুসলিম ছিল সে) নিজেকে প্রকাশ করত।'" (Ibn`Abbas said: 'No, that was a woman who, (although she was a Muslim), used to expose herself.'") (সুনান ইবনে মাজাহ ২৫৬০)

ব্যাপারটা হচ্ছে, যদি আপনি বা আপনারা আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) চেয়ে বাড়তি কিছু করতে যান তাহলে কখনোই আপনারা সমাজে বা রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। শুধুমাত্র এই বাধ্যতামূলক হিজাব করতে হবে, হিজাব ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না - এই ভয়ে বাংলাদেশের মেয়েরা, মহিলারা ইসলামী শরিয়া আইন চায় না। ফলে এই দেশে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা বর্তমানে অসম্ভব পর্যায়ে আছে। শরিয়ার কারণে নয়; শরিয়ার ভুল ব্যাখ্যা, বাড়াবাড়ি করার কারণে, এই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না। আল্লাহ নবীর (সাঃ) কাছে যে সকল আইন-কানুন, বিধি বিধান পাঠিয়েছেন তার চেয়ে কেন আপনারা বাড়াবাড়ি করে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন?

আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত
নবী (সাঃ) বলেছেন, "মানুষের জন্য (ধর্মীয় বিষয়াদি) সহজ করো, তাদের জন্য কঠিন করো না এবং তাদের সুসংবাদ দাও এবং তাদের (ইসলাম থেকে) পালিয়ে যেতে বাধ্য করো না।" (সাহিহ বুখারি, খণ্ড ১, বই ৩, সংখ্যা ৬৯)
এই একটি হাদিসে আপনাদের সকল বাড়াবাড়ির ঔষধ আছে। যদি শরিয়ার বিশুদ্ধ এবং মূল ২ টি উৎস – কোরআন, হাদিসের উপর ভিত্তি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হত তাহলে খুবই সহজেই এই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যেত। কিন্তু আলেম নামধারী কিছু লোকের বাড়াবাড়ির কারণে এই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না। কোরআন, হাদিসে কি আছে - তা তাদের কাছে মুখ্য বিষয় নয়, তাদের কাছে বড় হুযুর বা অমুক মুহাদ্দিস বা অমুক মুফতি কি বলেছেন সেটাই শেষ কথা। প্রতিটি বিষয় না বুঝেই তারা এই রূপ বাড়াবাড়ি করছে।
হিজাব না করার কারণে, মেয়েরা ছেলেদের পোশাক পড়লে যে শাস্তি হবে - সেটা আল্লাহ উক্ত পাপী ব্যাক্তিকে দিবেন বা ক্ষমা করবেন। এই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যাক্তিকে শাস্তি দেয়ার বা জোর করে হিজাব পড়ানোর কোনো এখতিয়ার কোরআন, হাদিস মোতাবেক খলিফা বা মুসলিম শাসকের নেই। এখন কোরআন, হাদিসের ব্যাখ্যা করে আল্লাহ এর রসূলের সুন্নত থেকে সরে গিয়ে কেউ যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে সে জন্য সে দায়ী হবে এবং তার বা তাদের এই সকল বাড়াবাড়ির কারণে যে সমাজে বা মুসলিম ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না - এই জন্য তাদের ভয়াবহ গুনাহ হচ্ছে এবং হবে। তাহলে, হিজাবের / পর্দার বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের কি নিয়ম হবে? সেই নিয়ম হবে যা কোরআন, হাদিসে সরাসরি দেয়া আছে অর্থাৎ যে যা পোশাক পড়বে তার জন্য সে আল্লাহ এর কাছে দায়বদ্ধ হবে; খলিফা বা মুসলিম শাসক বা ইসলামিক সরকারের কাছে দায়বদ্ধ হবে না। আমাদের দেশে কেউই উলঙ্গ হয়ে

বা বিকিনি পড়ে রাস্তায় বের হয় না। এখন যে যা পোশাক পড়ছে তাতে মুসলিম খলিফার বাধা দেয়ার মত বা শাস্তি দেয়ার মত কোন আইন কোরআন, হাদিসে নেই। খলিফা বা মুসলিম শাসক এটা নিশ্চিত করবেন যে, কোন মেয়েকে কেউ যেন রাস্তা-ঘাটে, কলেজে, চাকরীতে তার পোশাকের জন্য কটু কথা না বলে, বিরক্ত না করে - সেই মেয়ে হিজাব পড়ুক বা গেঞ্জি - প্যান্ট পড়ুক।

ছেলেমেয়েদের ফ্রী মিক্সিং বা মেলামেশাঃ

ফ্রি মিক্সিং বলতে আপনি - আমি কি বুঝছি?

ফ্রি মিক্সিং বলতে আমি বুঝছি, ছেলে মেয়েরা একসাথে স্কুল, কলেজে পড়ে, চাকরী করে, পার্কে আড্ডা দেয়, ঘুরতে যায়, খেলা দেখে, হাত ধরে হাটে বা কাধে হাত দিয়ে ঘুরে বা বসে থাকে, ইত্যাদি। এই সকল বিষয় বন্ধে খলিফার আইন করে শাস্তি দেয়ার কোন সুযোগ বিশুদ্ধ শরিয়াতে অর্থাৎ কোরআন, হাদিস অনুযায়ী নেই। অর্থাৎ এই সকল কাজ যার যার ব্যাক্তিগত ব্যাপার। এ জন্য যে এই কাজ করবে সে আল্লাহ এর কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, আল্লাহ এর ইচ্ছা হলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করবেন। মুসলিম শাসক বা খলিফার এই সকল ক্ষেত্রে আইন করে শাস্তির বিধান করে এই সকল কাজ বন্ধ করার কোন রকম বিধি-বিধান শরিয়ার বিশুদ্ধ উৎস অর্থাৎ কোরআন হাদিসে নেই। তাই, খিলাফা রাষ্ট্রে বা ইসলামী শরিয়া আইন সমাজে চালু হলে এই সকল কাজ যে কেউ তার ইচ্ছা অনুযায়ী করতে পারবে - এজন্য তাদেরকে কেউ অপমান করতে পারবে না বা কটু কথা বলতে পারবে না।

আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) সময় অন্তত এমন একজন নারী ছিল যার কাছে এমন লোকেরা যেত যারা তার মাহরাম ছিল না। বিষয়টা নবী সাঃ জানা সত্ত্বেও ঐ মহিলাকে কি শাস্তি দিয়েছিলেন ?

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:"আমি যদি প্রমাণ ছাড়া কাউকে পাথর মারতাম, তাহলে অমুককে পাথর মারতাম, কারণ তার কথাবার্তা, চেহারা (appearance) এবং তার কাছে প্রবেশকারীদের ব্যাপারে স্পষ্ট সন্দেহ রয়েছে।" সুনান ইবনে মাজাহ ২৫৫৯

যদি ছেলে মেয়েরা একে অপরকে ভালবাসে বা প্রেম করে তাহলে? এই ক্ষেত্রে, ইসলামী শরিয়া আইন তাদের জন্য আরও ভালো হবে।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যারা একে অপরকে ভালোবাসে তাদের জন্য বিবাহের মতো (ভালো) আর কিছুই নেই।" (হাসান হাদিস, সুনান ইবনে মাজাহ ১৮৪৭)

তাহলে, ইসলামী শরিয়া আইন চালু হলে, যারা একে অপরকে ভালবাসে তাদের জন্য ঘোষণা দিয়ে দেয়া হবে যে, তোমরা তোমাদের এলাকার কাজির কাছে চলে যাও। কাজি মেয়ের বাবা এবং ছেলের বাবাকে ডেকে এনে তোমাদের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দিবে। এখন প্রশ্ন আসবে যে, যদি মেয়ের বাবা রাজি না হয়? যদি ছেলের স্বভাব ভালো থাকে এবং সে যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে তাহলে, কাজি মেয়ের বাবাকে বুঝিয়ে তাদের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দিবে।

এখন প্রশ্ন আসবে, কলেজে পড়া, ভার্সিটিতে পড়া ছেলের আয় নেই – সে কিভাবে সংসার করবে, বউয়ের খরচ দেবে ? এটা পারিবারিকভাবে তারা ব্যবস্থা করবে। যেমনঃ বৌ তার কলেজ বা ভার্সিটির হোস্টেলে থাকবে আর স্বামী তার ভার্সিটির হল বা মেসে থাকবে। তারা যখন ইচ্ছা তখন কোন হোটেলে রুম ভাড়া করে থাকতে পারবে। ইসলামী ভূখণ্ডের সকল সরকারী এবং বেসরকারি হোটেলে বলা থাকবে যে, বিয়ের কাবিননামার ফটোকপি জমা দিয়ে যে কোন কাপল হোটেলের রুম ভাড়া নিয়ে থাকতে পারবে। এভাবে তারা স্বামী - স্ত্রী হিসেবে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। যদি তারা সন্তান না চায় তাহলে তারা কনডম ব্যাবহার করতে পারবে। এটা ইসলামী শরিয়াতে জায়েজ কারণ আযল করা আর কনডমের মূলনীতি একই তবে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ চাইলে, কনডম ব্যাবহার করার পরও বাচ্চা হবে। তাহলে, কনডম ব্যাবহার করলে কোন গুনাহ হবে না। আমি একদম খুলে খুলে বর্ণনা করছি। এখন প্রেমিক- প্রেমিকা হোটেলে গিয়ে হারামভাবে চাহিদা মেটায়, ইসলামী রাষ্ট্রে তারা হালালভাবে তাদের চাহিদা পূরণ করার সুযোগ পাবে। এই ধরণের স্বামী- স্ত্রীকে হোটেলে বা অন্য কোথাও কেউ যেন কোনভাবে অপমান বা অসম্মান না করে - এটা খলিফা বা মুসলিম শাসক নিশ্চিত করবে।

যদি এভাবে বিয়ে না করে ছেলে মেয়েরা প্রেম করে, একে অপরকে ভার্সিটিতে বা কলেজে বা পার্কের ঝোপ- ঝাড়ে চুমু খায় তাহলে? এজন্য তাদেরকে শারীরিক শাস্তি বা জরিমানা করার কোন বিধান ইসলামী শরিয়ার বিশুদ্ধ উৎস অর্থাৎ কোরআন, হাদিসে নেই অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও মুসলিম শাসক বা খলিফা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য কোন আইন বা নিয়ম করবেন না। প্রমান পরের হাদিসেঃ

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

এক ব্যক্তি এক মহিলাকে (অবৈধভাবে) চুম্বন করে নবী (ﷺ) এর কাছে গিয়ে তাঁকে বিষয়টি জানালো। আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন: "আর দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে (অর্থাৎ পাঁচটি ফরজ নামাজ) নিখুঁতভাবে নামাজ আদায় করো।" নিশ্চয়ই! সৎকর্ম মন্দ কাজকে দূর করে দেয় (১১.১১৪)।

লোকটি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি (শুধু) আমার জন্য?" তিনি বললেন, "এটা আমার সকল উম্মতের জন্য।" (সহীহ আল-বুখারী ৫২৬)
এখন কিছু মুহাদ্দিস বা ফিকহের দোহাই দানকারী আলেমরা ছেলে-মেয়েদের এক সাথে চাকরী করতে দিবে না, স্কুল কলেজে পড়তে দিবে না। এই সকল কাজ যদি কেউ করে - তাহলে তা বন্ধ করার জন্য কোন শাস্তির বিধান কি তারা শরিয়ার অকাট্য উৎস বা বিশুদ্ধ উৎস বা মূল উৎস কোরআন, হাদিস থেকে দেখাতে পারবেন? কখনোই পারবেন না। আল্লাহ এবং আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) আমাদের জন্য ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা সহজ করেছেন কিন্তু কিছু আলেম, মুহাদ্দিস আমাদের জন্য বাংলাদেশে ইসলামী শরিয়া আইন বাস্তবায়ন অসম্ভব করে তুলেছে।

এভাবে তারা বাড়াবাড়ি করে বাংলাদেশে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠাই অসম্ভব করে ফেলেছে। আসলে এরা দাজ্জালের বা শয়তানের ধোঁকায় পড়েছে। অনুগ্রহ করে কোরআন হাদিস ব্যাখ্যা করে মুহাম্মাদ সাঃ এর চেয়ে বেশি বুঝতে চাইয়েন না। মুহাম্মাদ সাঃ যা করেছেন, যা বলেছেন শরিয়া আইন নিয়ে তার চেয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না। নিচের হাদিসটি কি আপনারা পড়েন নি?
আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যখনই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মুসলমানদের কোন কাজের নির্দেশ দিতেন, তখন তিনি তাদেরকে এমন কাজের নির্দেশ দিতেন যা তাদের জন্য সহজ ছিল। তারা বলতেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার মতো নই। আল্লাহ আপনার পূর্ববর্তী ও ভবিষ্যতের পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।" এতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) রাগান্বিত হয়ে পড়লেন এবং তা তাঁর চেহারায় স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি এবং আল্লাহকে ভালোভাবে জানি।" (সাহিহ বুখারি খণ্ড ১, বই ২, সংখ্যা ১৯)

*** ইসলাম রাষ্ট্রে সরকারী স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা শিফটের ব্যবস্থা থাকবে বা আলাদা স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু বেসরকারি স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে যদি তারা ছেলেমেয়েদের একসাথে পড়ায় তাহলে এটা তাদের ব্যাপার – এজন্য যদি কোন গুনাহ হয় তাহলে এজন্য তারা আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহি করবে। এই ব্যাপারে মুসলিম সরকার বা শাসক তাদের আইন করে বা জরিমানা করে বাধা দিবেন না।

মেয়েদের একা একা চলা ফেরাঃ

একজন মেয়ে একা একা চলা ফেরা করতে পারবে। যদি দূরের পথে যাতায়াত করে তাহলে তার সাথে সে মাহরাম রাখবে কি না - এই ব্যাপারে মুসলিম শাসকের উপদেশ দেয়া ছাড়া কিছু করার নাই। যদি ঐ নারী ঢাকা থেকে সিলেটে একা একা যায় তাহলে সে নবীর কথা অমান্য করল কিন্তু এখানে গুনাহ তার হবে। আইন করে বা জরিমানা করে এটা বন্ধ করা যাবে না কারণ আল্লাহ এর রসূল সাঃ এই ব্যাপারে কোন শাস্তির বিধানের কথা বলেন নি বা কাউকে শাস্তি দেন নি।

নাটক, সিনেমা, গান, খেলা

অন্য কাউকে বিরক্ত না করে যদি কেউ গান শুনে, সিনেমা দেখে, নাটক দেখে তাহলে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এজন্য তার গুনাহ হবে। এই ব্যাপারে আইন করে বা শাস্তি দিয়ে এগুলি বন্ধ করার কোন দরকার খলিফা বা মুসলিম শাসকের নাই। তবে এই খানে একটি ব্যাপার আছে। ইসলামী রাষ্ট্র সরকারী খরচে এই সকল জিনিস (নাটক, সিনেমা, গান) আয়োজন করবে না। যদি কেউ এগুলি প্রাইভেট পর্যায়ে আয়োজন করে তাহলে সেটা তার ব্যাপার। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, এই সকল গান বাজনা যেন খোলা মাঠে আয়োজন করা না হয় কারণ এতে অন্য মানুষ বিরক্ত হতে পারে। যদি কেউ চায় তাহলে Indoor Stadium বা Indoor Hall ভাড়া করে এগুলি করতে পারে। নাটক, সিনেমা, গান যার ইচ্ছা সে তৈরি করবে, যার ইচ্ছা সে দেখবে। এই ব্যাপারে মুসলিম শাসক কোন রকম শাস্তির বিধান করবে না। এগুলি ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই জন্য ব্যক্তি আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহি করবে, খলিফার এই ব্যাপারে কিছু করার প্রয়োজন নাই। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন গান, নাটক, সিনেমা তৈরি বা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে না। রাষ্ট্র এই ব্যাপারে কোন টাকাও দিবে না। এগুলি প্রাইভেট পর্যায়ে অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে যার ইচ্ছা করবে এবং এজন্য সে আল্লাহ এর কাছে দায়ী থাকবে।

ইসলামী শরিয়াতে যিনাহ, ব্যাভিচারের শাস্তিঃ

ইসলামী শরিয়ার অকাট্য ও বিশুদ্ধ উৎসে অর্থাৎ কোরআন, হাদিসে যিনাহ এবং ব্যভিচারের শাস্তির বিধান পাওয়া যায় এবং এই আইনটি মুসলিম শাসক বা খলিফা কার্যকর করবেন। যে সমাজে বা রাষ্ট্রে ইসলামী শরিয়া আইন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত নেই – সেই রাষ্ট্রে বা সমাজে এই আইন কেউ কার্যকর করতে পারবেন না কারণ আংশিকভাবে শরিয়া আইন কার্যকর করা হারাম। (**এই অংশটি নিয়ে আমার আলাদা একটি বই আছে, বইটির নাম 'ইসলামী শরিয়াতে ব্যভিচার ও ধর্ষণের সঠিক শাস্তি' যদি সেই বইটি আপনি পড়ে থাকেন তাহলে এই অধ্যায় না পড়ে সরাসরি ১১০ পৃষ্ঠায় চলে যেতে পারেন এবং বোল্ড বা highlight করে লিখা "আমি এই বইয়ে এখন পর্যন্ত" থেকে পড়ুন)**

কুমারী নারী - পুরুষ বা বিবাহিত নারী - পুরুষ যদি অবৈধ যৌন সম্পর্ক করে তাহলে তাদেরকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। আসুন আমরা এই বিষয় সম্পর্কিত হাদিস পড়ি। এখানে আমি যে সকল হাদিস উল্লেখ করেছি এরূপ অন্য কিছু হাদিস আপনারা অন্য কোথাও হয়তো পেতে পারেন তবে আমি যে সকল হাদিস এখানে উল্লেখ করেছি সেখান থেকেই এই বিষয়ে ইসলামী শরিয়ার আইন পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে। (এই বইয়ে যে সকল হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে তাছাড়া অন্য তথ্য সমৃদ্ধ হাদিস পাবেন যা যিনাহ ও ব্যভিচারের শাস্তিকে প্রভাবিত করবে - এমন সম্ভাবনা নাই বললেই চলে)

প্রথমে আমরা কোরআনে উল্লেখিত সূরা নূরে বিবাহ বহির্ভূত সঙ্গমের জন্য আল্লাহ কি শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তা জেনে নেই।
"এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।(১) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত (বেত্রাঘাত) করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২) ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে। (৩) (সূরা নূরঃ ১-৩)

যদিও আল্লাহ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে অবিবাহিত এবং বিবাহিত যিনাহকারীর জন্য আলাদা শাস্তি দেন নি তারপরও উক্ত আয়াতে উল্লেখিত শাস্তিকে শুধুমাত্র অবিবাহিত পুরুষ - নারীর জন্য শাস্তি হিসেবে আলেমরা গ্রহন করেছেন এবং বিবাহিত পুরুষ - নারীর জন্য রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যাকে শাস্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাদের উক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি হচ্ছে, ওমর রাঃ এর কিছু হাদিস, ওসমান রাঃ এর হাদিস এবং আলী রাঃ এর হাদিস। তাদের যুক্তি হচ্ছে মুহাম্মাদ সাঃ, ওমর, ওসমান, আলী সবাই ব্যভিচারের জন্য রজম করাকে শাস্তি হিসেবে কার্যকর করেছেন। সুতরাং বিবাহিত নারী - পুরুষ যদি অবৈধ সঙ্গম করে তাহলে তাদের শাস্তি হবে রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা। তাদের এই রায় বা ফতোয়ার পিছনে আরেকটি যুক্তি হচ্ছে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ শুধুমাত্র অবিবাহিত যিনাহকারীদের জন্য আইন দিয়েছেন কারণ সূরা নূরের ৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ যিনাহকারীর জন্য যিনাহকারী বা মুশরিক ছাড়া অন্য কাউকে অর্থাৎ মুমিনকে বিয়ে করা হারাম করে দিয়েছেন। এখন

যুক্তি হচ্ছে বিবাহিত যিনাহকারীর তো বিভিন্ন হাদিস মোতাবেক পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডই কার্যকর করা হবে তাহলে সে আবার বিয়ে করবে কিভাবে এবং বিবাহিত যিনাহকারী-তো বিবাহিত-ই তাহলে সে আবার বিয়ে করবে কি? সুতরাং সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতের আইন শুধুমাত্র অবিবাহিত যিনাহকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ তাদের মতে ইসলামে বিবাহিত যিনাহকারীর শাস্তি হচ্ছে রজম আর অবিবাহিত যিনাহকারীর জন্য শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত।

বিবাহিত এবং অবিবাহিত যিনাহকারীর জন্য ইসলামে কি শাস্তি তা জানার জন্য আমরা তিনভাবে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করব। প্রথমে, কোরআন এবং হাদিস থেকে, তারপর শুধু হাদিস থেকে, তারপর শুধু কোরআন থেকে। যদি আমরা তিন ক্ষেত্রেই একই আইন পাই তাহলে আমরা ইসলামে বিবাহিত এবং অবিবাহিত যিনাহকারীর জন্য শাস্তির সঠিক আইনটি পেয়ে যাবো।

আশ-শাইবানী থেকে বর্ণিত:

আমি `আবদুল্লাহ বিন আবি `আওফাকে (রাঃ) রজম (অবৈধ যৌন মিলনের জন্য কাউকে পাথর মেরে হত্যা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাঃ রজমের শাস্তি কার্যকর করেছিলেন," আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কি সূরা-নূর নাযিল হওয়ার আগে না পরে?" তিনি বললেন, "আমি জানি না।" (সহীহ আল-বুখারী ৬৮৪০; বই ৮৬, হাদিস ৬৩; অনুরূপ হাদিস বুখারি বই ৮৬, হাদিস নাম্বার -৪২)

এই হাদিসটি অবিবাহিত এবং বিবাহিত নারী- পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্কে কি শাস্তি দেয়া হবে তা নির্ধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস। আশ- শাইবানী আল্লাহ এর রসূল (সা) রজম করেছিলেন সূরা নুর নাযিল হবার আগে নাকি পড়ে - এটা কেন জানতে চেয়েছিলেন ? কারণ যদি আল্লাহ এর রসূল সাঃ সূরা নুর নাযিল হবার আগে রজম করে থাকেন এবং সূরা নুর নাযিল হবার পর তিনি যদি আর কাউকে (বিবাহিত ব্যভিচারিসহ) যিনাহ / ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে রজম না করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে, সূরা নুরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য যে শাস্তি উক্ত আয়াতে বলেছেন তা বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য হবে এবং অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য শাস্তি হিসেবে আর কাউকেই পাথর নিক্ষেপে হত্যা অর্থাৎ রজম করা হবে না। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন আবি `আওফা (রাঃ) এই বিষয়টা জানতেন না। বুঝা গেলো, অনেক সাহাবীই হয়তো এই বিষয়টা জানতেন না।

এখন আমরা হাদিসের ভাষা এবং শাস্তির বিধান দেখে বুঝতে চেষ্টা করবো কোন হাদিসটি কোন সময়ের। কোন হাদিসটি সূরা নুর নাযিল হবার আগের আর কোন হাদিসটি সূরা নুর নাযিল হবার পরের।

উবাদা বিন আস-সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও। আল্লাহ তাদের জন্য একটি পথ নির্ধারণ করেছেন। যখন কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিত মহিলার সাথে ব্যভিচার করে, তখন তাদের একশটি বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া উচিত। আর যদি বিবাহিত পুরুষ কোন বিবাহিত মহিলার সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের একশটি বেত্রাঘাত এবং পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হবে। (সহিহ মুসলিম ১৬৯০ক)

এই হাদিসটি কোরআনের সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের আগের বলে প্রতীয়মান হচ্ছে কারণ প্রায় সকল ফকিহদের মতামত হচ্ছে অবিবাহিত যিনাহকারীর জন্য শাস্তি হচ্ছে সূরা নুরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ এর নির্ধারিত শাস্তি --- ১০০ বেত্রাঘাত কিন্তু উক্ত হাদিসে আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, "যখন কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিত মহিলার সাথে ব্যভিচার করে, তখন তাদের একশটি বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া উচিত" অর্থাৎ শাস্তির বিধান কোরআনের সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ এর বলা শাস্তির সাথে মিলছে না এর কারণ হচ্ছে এই হাদিসে নবীর (সাঃ) বলা শাস্তিটি সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের আগের যা আল্লাহ-ই মুহাম্মাদ সাঃ কে বলতে বলেছিলেন। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, নবী সাঃ উক্ত হাদিসে বলেছেন, "আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও। আল্লাহ তাদের জন্য একটি পথ নির্ধারণ করেছেন"। যদি তখন সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হয়েই যেত তাহলে এই কথা বলার প্রয়োজন ছিল না যে, “ আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও; আল্লাহ তাদের জন্য একটি পথ নির্ধারণ করেছেন" কারণ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তো পথ দিয়েই দিয়েছেন। "আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও। আল্লাহ তাদের জন্য একটি পথ নির্ধারণ করেছেন" এই কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এই হাদিসের পূর্বে মুসলিমদের জন্য অবৈধ যৌনতার কারণে কোন শাস্তির বিধান ছিল না তাই, আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, "আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও। আল্লাহ তাদের জন্য একটি পথ নির্ধারণ করেছেন"। আল্লাহ কাদের জন্য পথ নির্ধারণ করেছেন ? মুসলিমদের মধ্যে যারা অবৈধ যৌন কাজ করেছিল তাদের অপরাধের কাফফারা দিয়ে আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য। "আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও" কথার অর্থ হচ্ছে কোরআনে যেহেতু অবৈধ যৌন

সম্পর্কের শাস্তি নিয়ে তখনো কোন আয়াত নাযিল হয়নি তাই নবী সাঃ বলেছেন যে, আমার কাছ থেকে নাও – তারপর তিনি আল্লাহ এর নির্ধারিত শাস্তির বিধান সাহাবীদের জানিয়ে দিয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

আবু হুরায়রা এবং যায়েদ বিন খালিদ আল-জুহানী বর্ণনা করেছেন যে, মরুভূমির একটি গোত্র আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার কাছে আল্লাহর নামে প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমার সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করুন। দ্বিতীয় দাবিদার যিনি তাঁর চেয়ে জ্ঞানী ছিলেন, তিনি বললেন: আচ্ছা, আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করুন, তবে আমাকে (কিছু বলার অনুমতি দিন)। তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন: বলুন। তিনি বললেন: আমার ছেলে এই ব্যক্তির বাড়িতে দাস ছিল এবং সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। আমাকে জানানো হয়েছিল যে আমার ছেলে (এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে) পাথর ছুঁড়ে হত্যার যোগ্য। আমি এর জন্য একশটি ছাগল এবং একটি দাসী মুক্তিপণ হিসেবে দিয়েছি। আমি আলেমদের জিজ্ঞাসা করেছি (এটি কি এই অপরাধের কাফফারা হিসেবে কাজ করতে পারে)। তারা আমাকে জানালো যে আমার ছেলের জন্য একশটি বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন প্রাপ্য এবং এই মহিলার জন্য (যেহেতু সে বিবাহিত ছিল) পাথর নিক্ষেপে (হত্যা) প্রাপ্য। তখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন: যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করব। দাসী এবং ছাগল ফেরত দিতে হবে, এবং তোমার ছেলের জন্য একশটি বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন। আর হে উনাইস (ইবনে জুহাক আল-আসলামী), সকালে এই মহিলার কাছে যাও, যদি সে স্বীকারোক্তি করে, তাহলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করো। বর্ণনাকারী বলেন: তিনি সকালে তার কাছে গেলেন এবং তিনি (সেই মহিলা) স্বীকারোক্তি দিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার সম্পর্কে ঘোষণা করলেন এবং তাকে পাথর নিক্ষেপে (হত্যা) করা হল। (সহিহ মুসলিম বই ১৭, হাদিস নম্বর ৪২০৯)

এই ঘটনাটিও কোরআনে অবৈধ যৌন সম্পর্কের শাস্তি নিয়ে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের আগের ঘটনা কারণ অবিবাহিত পুরুষকে আল্লাহ এর রসূল সাঃ এই হাদিসে সহিহ মুসলিম ১৬৯০ক হাদিসে উল্লেখিত শাস্তি দিয়েছিলেন আর তা হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত এবং ১ বছরের জন্য নির্বাসন। মহিলাকে সহিহ মুসলিম ১৬৯০ক হাদিসে উল্লেখিত একশটি বেত্রাঘাত এবং পাথর ছুঁড়ে হত্যার শাস্তির মধ্যে শুধু পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি দিয়েছিলেন কিন্তু ১০০ টি বেত্রাঘাতের কথা বলেন নি অর্থাৎ

বিবাহিত অবৈধ যৌন সম্পর্ককারীর জন্য শাস্তির বিধান তখন পাল্টে গিয়েছিল। এটা কখন হয়েছিল? খুব সম্ভবত এটা সেই সময়ের কথা যার কথা ওমর রাঃ বলেছেন।

কাসির ইবনে আল সালত বর্ণনা করেছেন: আমর ইবনে আল-আস এবং যায়েদ ইবনে সাবিত কুরআন লিখে রাখতেন। তারা এই আয়াতটি পড়ে শোনালেন, এবং যায়েদ বললেন, "আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।" উমর বললেন, "যখন এটি অবতীর্ণ হলো, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম এবং বললাম: আমাকে এটি লিখতে দিন।" শু'বা বললেন, "এটা এমন ছিল যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা অপছন্দ করতেন।" উমর বললেন, "নিঃসন্দেহে, তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, যদি কোন বৃদ্ধ অবিবাহিত থাকে, তাহলে তাকে কেবল বেত্রাঘাত করা হয়, আর যদি কোন যুবক বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করে তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।" (মুসনাদে আহমাদ ২১৫৯৬)

"বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং (বিবাহিত) বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।" --- এটি কোরআনের একটি আয়াত ছিল। বুঝা যাচ্ছে, সহিহ মুসলিম বই ১৭, হাদিস নম্বর ৪২০৯ এর ঘটনা যখন ঘটেছিল তখন কোরআনের এই আয়াতটির আইন কার্যকর ছিল এবং সহিহ মুসলিম ১৬৯০ক তে বর্ণিত শাস্তির শুধু অবিবাহিতদের জন্য বর্ণিত শাস্তিটি তখন কার্যকর ছিল। কিন্তু তখনো সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হয়নি কারণ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে শুধু ১০০ বেত্রাঘাতের কথা বলা আছে যার ব্যাপারে ফকিহগন একমত যে এটি অবিবাহিত যিনাহকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে কিন্তু সহিহ মুসলিম বই ১৭, হাদিস নম্বর ৪২০৯ তে অবিবাহিত পুরুষকে তো ১০০ বেত্রাঘাতের সাথে সাথে ১ বছরের জন্য নির্বাসনের শাস্তিও দেয়া হয়েছিল যা সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে নেই কিন্তু সহিহ মুসলিম ১৬৯০ক নাম্বার হাদিসে আছে।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে বসে বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং তাঁর উপর যা নাজিল হয়েছিল তাতে পাথর ছুঁড়ে মারার আয়াতটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা তা পাঠ করেছি, আমরা মুখস্থ করেছি এবং তা বুঝতে পেরেছি। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বিবাহিত ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার শাস্তি দিয়েছিলেন এবং

তাঁর পরে আমরাও পাথর ছুঁড়ে হত্যার শাস্তি দিয়েছিলাম। আমার আশঙ্কা, সময়ের সাথে সাথে লোকেরা (এটা ভুলে যেতে পারে) এবং বলতে পারে: আমরা আল্লাহর কিতাবে পাথর ছুঁড়ে মারার শাস্তি পাই না, এবং এভাবে আল্লাহর নির্ধারিত এই দায়িত্ব পরিত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, (অবৈধ) গর্ভাবস্থার পর, অথবা স্বীকারোক্তির পর ব্যাভিচারকারী বিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আল্লাহর কিতাবে পাথর ছুঁড়ে মারা একটি কর্তব্য। (সহিহ মুসলিম বই ১৭, হাদিস নম্বর ৪১৯৪; অনুরূপ হাদিস সহীহ বুখারী খণ্ড ৮, বই ৮২, হাদিস নম্বর ৮১৬; অনুরূপ হাদিস জামে আত-তিরমিযী ১৪৩২; অনুরূপ হাদিস সহীহ, আল-বুখারী ২৪৬২ এবং মুসলিম ১৬৯১ (দারুসসালাম) মুসনাদে আহমাদ ২৪৯;)

"বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং (বিবাহিত) বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।" কোরআনের এই আয়াতটি নাযিলের পর বিবাহিত যিনাহকারীদের জন্য কি শাস্তি ছিল এবং অপরাধী প্রমাণের জন্য কি কি পদ্ধতি ছিল তা ওমর রাঃ এর কথা থেকে জানা যায় যা উপরের হাদিসে (সহিহ মুসলিম বই ১৭, হাদিস নম্বর ৪১৯৪) বর্ণিত হয়েছে।

মদিনায় ইসলামী শরিয়া আইন ভিত্তিক সমাজে ভিন্ন ধর্মের (পৈত্তলিক / খ্রিষ্টান) আলেমরাও এই আইনগুলো জানত কারণ তখন হুদুদের আইন সবার জন্য একই ছিল। কিন্তু ইহুদীরা এটা মানতে পারত না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে কারণ তারা নবীর সাঃ কাছে তাদের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে এসেছিল।

আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত: ইহুদীরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে জানালো যে, তাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা অবৈধ যৌন সম্পর্ক করেছে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের বললেন, "তোমাদের (পুরাতন নিয়মে / তাওরাতে) আর-রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) এর আইনগত শাস্তি সম্পর্কে তোমরা কী পাও?" তারা বলল, (কিন্তু) আমরা তাদের অপরাধ ঘোষণা করছি এবং তাদের বেত্রাঘাত করছি।" আবদুল্লাহ বিন সালাম বললেন, "তুমি মিথ্যা বলছো; তাওরাতে রজমের আদেশ আছে।" তারা তাওরাত এনে খুললো এবং তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর হাত রাখলো এবং তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আয়াতগুলো পড়লো। আবদুল্লাহ বিন সালাম তাকে বললেন, "তোমার হাত তুলো।" যখন সে তার হাত তুললো, তখন সেখানে রজমের আয়াত লেখা ছিল। তারা বলল, "মুহাম্মদ (সাঃ) সত্য বলেছেন; তাওরাতে রজমের আয়াত আছে।" এরপর নবী (সাঃ) তাদের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। ('আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাঃ) বলেন, "আমি লোকটিকে পাথর থেকে রক্ষা করার জন্য মহিলার উপর ঝুঁকে থাকতে দেখেছি।") (সহীহ বুখারী খণ্ড

৪, বই ৫৬, হাদিস নম্বর ৮২৯; অনুরূপ হাদিস সহীহ আল-বুখারী ৩৬৩৫; অনুরূপ হাদিস সহীহ বুখারী খণ্ড ৬, বই ৬০, হাদিস নম্বর ৭৯; অনুরূপ হাদিস সহীহ বুখারী ৮ম খণ্ড, বই ৮২, হাদিস নম্বর ৮০৯; অনুরূপ হাদিস মিশকাত আল-মাসাবিহ ৩৫৫৯; অনুরূপ হাদিস সুনানে আবু দাউদ ৪৪৪৬; অনুরূপ হাদিস মুয়াত্তা ইমাম মালিক বই ৪১, হাদিস ১)

ইহুদীরা যখন নবী সাঃ এর ঘোষিত কোরআনের আয়াত অনুযায়ী নিজেদের ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা না করতে তাদের তাওরাত নিয়ে এসেছিল তখন আবদুল্লাহ বিন সালাম তাদের বলেন, “তুমি মিথ্যা বলছো; তাওরাতে রজমের আদেশ আছে।” এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তখনো কোরআনের সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হয়নি কারণ যদি কোরআনের সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত এই ঘটনার পূর্বেই নাযিল হত তাহলে ইহুদীরা, খুব সম্ভবত, এই কথাও বলত যে, কোরআনে রজমের আয়াত নেই। এভাবে তারা নিজেদের বিবাহিত অবৈধ ব্যভিচারীকে বাচাতে চাইত। আবদুল্লাহ বিন সালাম রাঃ এর কথায় এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে তখনো কোরআনের এই আয়াতটির আদেশ-ই কার্যকর ছিল --- "বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং (বিবাহিত) বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।” তাই ইহুদীরা যখন এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করতে এসেছিল তখন মুহাম্মাদ সাঃ তাদের তাওরাতে কি বলা আছে তা তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন ফলে ইহুদীরা তাওরাতের রজমের আয়াত লুকাতে চাইলে আবদুল্লাহ বিন সালাম তাদের একজন লোকের হাত তুলতে বললে তাওরাতে রজমের আয়াতটি দেখা যায়।

উপরোক্ত ঘটনা অনেকগুলো হাদিসে আসছে। এখানে খেয়াল করার মত বিষয় হচ্ছে, এই ঘটনায় আল্লাহ এর রসূল সাঃ তাওরাত অনুযায়ী ইহুদীদের বিচার ফয়সালা করেছেন। তিনি এই ক্ষেত্রে কোরআনের আইন অনুযায়ী বিচার -ফয়সালা করেন নি।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল মসজিদে বসে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি অবৈধ যৌন মিলন করেছি।" নবী তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি যে দিকে নবী (সাঃ) মুখ ফিরিয়েছিলেন, সেদিকে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি অবৈধ যৌন মিলন করেছি।" নবী তার মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন, এবং লোকটি সেই দিকে এসে চারবার স্বীকারোক্তি করলে নবী তাকে ডেকে বললেন, "তুমি কি পাগল?" সে বলল, "না, হে আল্লাহর রাসূল!" নবী বললেন, "তুমি কি বিবাহিত?"

সে বলল, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।" নবী (সাঃ) বললেন, "তাকে নিয়ে যাও এবং পাথর মেরে হত্যা করো।" ইবনে শিহাব আরও বলেন, “জাবির (রাঃ) এর কথা শুনে একজন আমাকে বলেছিল যে, জাবির বলেছেন, ‘আমিও ঐ ব্যক্তিকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলাম, আর আমরা তাকে মুসাল্লায় (‘ঈদের নামাজের স্থান) পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলাম, আর যখন পাথরগুলো তাকে কষ্ট দিচ্ছিল, তখন সে দ্রুত লাফিয়ে পালিয়ে গেল, কিন্তু আমরা তাকে আল-হাররায় ধরে ফেলেছিলাম এবং (সেখানে) পাথর ছুঁড়ে মেরে হত্যা করেছিলাম।” (সহিহ বুখারী ৮ম খণ্ড, বই নং ৮২, হাদিস নম্বর ৮১৪ অনুরূপ হাদিসঃ সহীহ বুখারী ৭ম খণ্ড, ৬৩তম বই, হাদিস নম্বর ১৯৬; অনুরূপ হাদিস জামে আত-তিরমিযী ১৪২৯; অনুরূপ হাদিস মিশকাত আল-মাসাবিহ ৩৫৬০ --- এই হাদিসের শেষ অংশে বলা আছে, “ এরপর নবী (সাঃ) তার সম্পর্কে ভালো কথা বললেন এবং তার জন্য নামাজ পড়লেন।)

এই হাদিসে আমরা দেখতে পেলাম যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ উক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তিমূলক অবৈধ যৌন মিলনের কথা শুনতে চাচ্ছিলেন না এজন্যই তিনি বার বার লোকটির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু লোকটি বার বার-ই নবীর (সাঃ) সামনে গিয়ে নিজের বিরুদ্ধে নিজেই সাক্ষী দিচ্ছিল বা স্বীকারোক্তি দিচ্ছিল যে, সে অবৈধ যৌন মিলন করেছে। তিনি জেনে বুঝেই নিজের উপরে পাথর নিক্ষেপের শাস্তি চাচ্ছিলেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই ঘটনার সময় সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হয়েছিল কি না - তা বুঝা যাচ্ছে না তবে এই ঘটনাটিও সূরা নুরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের আগের ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে, যখন আমরা সূরা নুর বুঝে বুঝে পড়ব – তখন আমরা এই ঘটনা কবে ঘটেছিল তা বুঝতে পারব।

"এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।(১) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ’ কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু’মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২) ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে। (৩) (সূরা নূরঃ ১-৩)

আমরা সহিহ মুসলিম ১৬৯০ক, সহিহ মুসলিম বই ১৭, হাদিস নম্বর ৪২০৯, মুসনাদে আহমাদ ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসগুলো থেকে বুঝতে পেরেছি যে, যিনাহ, ব্যভিচারের শাস্তির পরিবর্তন হচ্ছিল। প্রথমে ছিল অবিবাহিত লোকের জন্য ১০০ বেত্রাঘাত এবং ১ বছরের জন্য নির্বাসিত এবং বিবাহিত লোকের জন্য ১০০ বেত্রাঘাত এবং রজম। পরে মুসনাদে আহমাদ ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে বর্ণিত কোরআনের আয়াত নাযিল হলে বিবাহিত লোকের জন্য আইন পরিবর্তন হয়ে যায় তখন বেত্রাঘাতকে বাতিল করে শুধু রজমের শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু আমরা মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিস থেকে জানতে পারি যে, "বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।" আয়াতটি নাযিল হলে ওমর রাঃ নবীর (সাঃ) কাছে এই আয়াতটি কোরআনের ভিতরে লিখার অনুমতি চেয়েছিলেন কিন্তু হাদিসে অন্যান্য কথোপকথন ও অন্য কিছু হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) কোরআনের এই আয়াতটি লিখতে দেন নি, এই আয়াতের কোন নাম্বারও পাওয়া যায় না। এই আয়াতটি কখনোই কোরআনের কোন সূরার অংশ ছিল না। মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিস থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে, "শু'বা বললেন, "এটা এমন ছিল যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা অপছন্দ করতেন"। অর্থাৎ আয়াতটির প্রতি নবী সাঃ এর মনোভাব দেখে কারো কারো মনে হয়েছিল যে আয়াতটি বা আয়াতে উল্লেখিত যে আইন আল্লাহ দিয়েছেন তা আল্লাহ এর রসূল সাঃ যেন অপছন্দ করতেন। ওমর রাঃ এর অন্য হাদিসে পাওয়া যায় যে, ঐ সময়ে উক্ত আয়াতটি সাহাবীরা পড়েছেন, মুখস্থ করেছেন কিন্তু লিখে রাখার অনুমতি পান নি। কোরআনের অন্য আয়াত যখন লিখে রাখা হচ্ছিল তখন এই আয়াতটি না লিখার কারণ কি ? এমন কি ওমর রাঃ এই আয়াতটি লিখার জন্য নবীর রাঃ কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন কিন্তু প্রতীয়মান হয় যে, উনাকে আল্লাহ এর রসূল সাঃ এই আয়াতটি লিখে রাখার অনুমতি দেননি। যাই হোক, এই কথাটা নিশ্চিত যে, রজম সম্পর্কিত এই আয়াতটি কোরআনের কোন সূরার অংশ ছিল না। এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহ আইন দেয়ার আগের আয়াতে অর্থাৎ সূরা নূরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন যে, "এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর"।(১) (সূরা নুর -১)

এখন নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াত , "বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।" এর সাথে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতের মর্যাদাগত পার্থক্য।

"এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর"।(১) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত / বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২) (সূরা নুর ১-২)

মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতকে আল্লাহ কোন সূরার অংশ করেন নি কিন্তু সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের শাস্তি সম্পর্কে বলার আগেই আল্লাহ বলে দিচ্ছেন – এটি একটি সূরা। অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন যে, আমার বান্দারা এখন আমি যে আইন দিবো তা কিন্তু একটি সূরার অংশ অর্থাৎ এটাই আমার পক্ষ হতে এই সম্পর্কে চূড়ান্ত আইন। আল্লাহ আরও বলছেন যে, এই সুরাটি এবং এর মধ্যেকার আইন আমিই নাযিল করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি। চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ সূরা নূরে উল্লেখিত আইনকে কত গুরুত্ব এবং জোর দিয়ে বলা শুরু করেছেন। আল্লাহ তারপর বলছেন যে সূরা নুরে অবতীর্ণ করা আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট – অর্থাৎ এখানে না বুঝার মত কিছুই নেই বা এটা নিয়ে মত পার্থক্য করার মত কিছু নেই। তারপর তিনি বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে সকল মানুষের জন্য নতুন আইন দিলেন যার ফলে এই সম্পর্কিত পূর্বের সকল আইন বাতিল হয়ে গেলো। আগে আইন ছিল অবিবাহিতের জন্য ১০০ বেত্রাঘাত এবং ১ বছরের নির্বাসন আর বিবাহিতের জন্য রজম। ২ রকম ঘটনার জন্যই এখন আইন হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত। যারা একমত নন তাদের জন্যঃ

সূরা শব্দটির অর্থ হচ্ছে বেড়া বা দেয়াল বা পদ মর্যাদা বা উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ যাকে ইংলিশে যথাক্রমে বলে fence, wall, rank, high position.

কোরআনের রজমের আয়াতসহ অবৈধ যৌন সম্পর্কের শাস্তির জন্য যত আইন আল্লাহ সূরা নুর নাযিল করার আগে দিয়েছিলেন তার কোন টিকেই আল্লাহ কোন সূরার অংশ করেন নি। অর্থাৎ সূরা নূরের আয়াতে অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য আল্লাহ যে আয়াত নাযিল করেছেন তা তার পূর্বের সকল আয়াতকে বা আইনকে মর্যাদার দিক থেকে অতিক্রম করে যাবে। কোরআনের আয়াতকে সূরার মধ্যে রাখার অর্থ হচ্ছে এই আয়াতগুলোকে বেড়া বা দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছে অর্থাৎ এই আয়াতগুলোর কোন পরিবর্তন হবে না। এই আয়াতগুলো হারিয়ে যাবে না, কেউ বলতে পারবে না যে, এই আয়াত কোথা থেকে আসল – এটা তো কোরআনে নেই। কিন্তু কোরআনের কোন আয়াত যদি সূরা

দ্বারা সুরক্ষিত না করা হয় তাহলে এমন সম্ভাবনা প্রবল যে ঐ আয়াতকে বা আয়াতের আইনকে ভবিষ্যতে বাতিল করা হতে পারে। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতে উল্লেখিত আইনকে পরিবর্তন করা হবে এমন সম্ভাবনা প্রথম থেকেই প্রবল ছিল যার ইঙ্গিত এখান থেকেও পাওয়া যায় যে, নবী সাঃ উক্ত আয়াত কাউকে লিখে রাখার অনুমতি দেন নি। এই রূপ সতর্কতার কারণ সম্ভবত এটা যে, উক্ত আয়াতটি যেন কোনভাবেই কোরআনের কোন সূরার ভিতরে ঢুকতে না পারে এবং ভবিষ্যতে যেন কোরআনের অংশ হতে না পারে। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, রজম সম্পর্কিত কোরআনের উক্ত আয়াতটি কিছু সময়ের জন্য আইন হিসেবে আল্লাহ নাযিল করেছিলেন যাকে কোরআনের কোন সুরায় ঢুকতে দেয়া হয়নি এবং কোরআনের অংশও করা হয়নি। সূরা শব্দের অন্য একটি অর্থ হচ্ছে উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন। সূরা নূরের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ এখন যা আয়াত বা আইন নাযিল করবেন তা একটি সূরার অংশ অর্থাৎ কোরআনের অন্য কোন আয়াত যদি সূরার বাহিরে থাকে তাহলে তার চেয়ে সূরা নুরে আল্লাহ যা নাযিল করবেন তার মর্যাদা বেশি ও আইন হিসেবে অধিকতর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। সূরা শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে 'পদ'। কোরআনের কোন আয়াত যদি কোন সূরার অংশ হয় তাহলে সেই আয়াতটির একটি পদ আছে কিন্তু কোরআনের কোন আয়াত যদি কোন সূরার অংশ না হয় তাহলে সেই আয়াতটির কোন পদ নেই। এখন প্রশ্ন আসবে যে, কিন্তু এখান থেকে এই কথা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, সূরা নূরের ২য় আয়াত দ্বারা রজমের আইন বাতিল হয়ে গেছে ?

সূরা নূরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, আমি এখন যা নাযিল করবো তা একটি সূরার আয়াত তার মানে আল্লাহ ইতিপূর্বে রজম নিয়ে যে আয়াত (মুসনাদে আহমাদ ২১৫৯৬) নাযিল করেছিলেন কিন্তু তাকে কোন সূরার অংশ করেন নি - সেই আয়াতের সাথে এই আয়াতের মর্যাদাগত পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করে প্রথমেই বলে দিয়েছেন যে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে আমি যা নাযিল করতে যাচ্ছি তা হচ্ছে একটি সূরার অংশ কিন্তু ইতিপূর্বে রজম সম্পর্কিত যে আয়াত নাযিল করেছিলাম তা কোন সূরার অংশ ছিল না ফলে এই আয়াত দ্বারা রজমের ঐ আয়াতের আইন বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া সূরা নূরের প্রথম আয়াতের প্রথমেই আল্লাহ কেন বললেন যে, এটি একটি সূরা। এটা এই কারণে যে, আল্লাহ আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে - আগে আল্লাহ রজম নিয়ে যে আয়াত নাযিল করেছিলেন তার সাথে এখন যে আয়াত নাযিল করবেন তাদের উভয়ের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য আছে। আল্লাহ যে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে বিবাহিত যিনাহকারীর জন্যও আইন দিচ্ছেন তার ইঙ্গিত আল্লাহ সূরা নূরের প্রথম আয়াতে দিয়ে দিয়েছেন এই কথা বলে যে এখন যা নাযিল করবো তা হচ্ছে সূরার অংশ আর

আগে যা নাযিল করেছিলাম তা সূরার অংশ ছিল না। অর্থাৎ এখন সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে যে আইন দিচ্ছি তা বিবাহিত যিনাহকারীর জন্যও প্রযোজ্য হবে কারণ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতের সাথে মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতের সাথে তুলনা করা হয়েছে এই কথা বলে যে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত হচ্ছে একটি সূরার অংশ। অপরদিকে, মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতটি কোন সূরার অংশ নয়; দুটি আয়াতের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য আল্লাহ আমাদেরকে বুঝাচ্ছেন তাহলে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত অবশ্যই মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতের আইনকে বাতিল করে নতুন আইন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। আল্লাহ কেন দু'টি আয়াতের মধ্যে একটি সূরার অংশ, অপরটি সূরার অংশ নয় – এই দিকে ইঙ্গিত করবেন যদি এই দু'টি আয়াতে উল্লেখিত আইনগুলোর মধ্যে সম্পর্ক না থাকে। সম্পর্ক আছে আর সেটা যেন আমরা বুঝতে পারি সে জন্য সূরা নূরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, এখন যা আইন নাযিল করছি তা একটি সূরার অংশ আর আগে যা নাযিল করেছিলাম তা সূরার অংশ ছিল না সুতরাং তোমরা বুঝে নাও যে, মর্যাদার দিক থেকে এই আইনটি পূর্বে নাযিল করা আইনের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ সুতরাং এই আইনটি (সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে নাযিল করা আইনটি) আগে নাযিল করা আইনকে বাতিল করে দিবে। অর্থাৎ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতের আইন শুধু অবিবাহিতদের জন্য নয়, উক্ত আয়াত বিবাহিত, অবিবাহিত সকল যিনাহকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ চাইলে, যখন সূরা নূরের ১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াত আমরা বুঝে বুঝে পড়ব তখন এই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে, আমরা হাদিস থেকেও এই বিষয়টা দেখব।

শারাহার স্বামী সিরিয়ায় অনুপস্থিত ছিল। তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়লেন এবং তার পূর্বতন মালিক তাকে আলীর (রাঃ) কাছে নিয়ে এসে বললেন: এই মহিলা ব্যাভিচার করেছে। **সে স্বীকার করেছে।** তাই তিনি বৃহস্পতিবার তাকে একশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং শুক্রবার তাকে পাথর মেরে (হত্যা) করেছেন। তিনি তার নাভি পর্যন্ত একটি গর্ত খনন করেছিলেন এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। **তারপর তিনি (আলী (রাঃ)) বললেন: (ব্যাভিচারের শাস্তি হিসেবে) পাথর মেরে (হত্যা করে) ফেলা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্নাত।** যদি কেউ তাকে এটি করতে দেখে, তাহলে যে সাক্ষী হয়েছে সে যেন প্রথম পাথর মারে; সে যেন তার সাক্ষ্য দেয় এবং সাক্ষ্যের পর পাথর মারে। কিন্তু সে (ঐ মহিলা) স্বীকার করেছে (স্বীকারোক্তি দিয়েছে), তাই আমিই প্রথম তাকে পাথর মারব। উনি (আলী রাঃ)

তার (ঐ মহিলার) উপর একটি পাথর মেরেছিলেন, তারপর লোকেরা তাকে পাথর মেরেছে এবং আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। আল্লাহর কসম, আমি তাকে হত্যাকারীদের মধ্যে ছিলাম। (মুসনাদে আহমাদ ৯৭৮)

সালিমা এবং মুজালিদ থেকে বর্ণিত, তিনি আশ-শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আলী (রাঃ) কুফাহ অঞ্চলের এক মহিলা সম্পর্কে বলেছেন --- যাকে তিনি বৃহস্পতিবার বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং শুক্রবারে পাথর মেরেছিলেন --- "**আমি তাকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে বেত্রাঘাত করেছি এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ অনুসারে পাথর মেরেছি।** (মুসনাদে আহমাদ ৭১৬ সহীহ হাদিস; এর পুরুষরা সিক্বাত (দারুস সালাম))

আলী রাঃ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর একজন বিবাহিত মহিলাকে অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন। ঘটনাটি কুফায় সংঘটিত হয়েছিল। আলী (রাঃ) প্রথমে বৃহস্পতিবার মহিলাকে ১০০ বেত্রাঘাত করেন এবং শুক্রবার উক্ত মহিলাকে রজম করেন। তারপর আলী রাঃ বলেন যে, উনি কোরআনের আইন অনুযায়ী বেত্রাঘাত করেছেন আর নবীর সুন্নত মোতাবেক রজম করেছেন। আলী রাঃ কিন্তু এই কথা বলেন নি যে, আমি আল্লাহ এর পূর্বে নাযিল করা রজমের আয়াতের আইন মেনে মহিলাকে রজম করেছি বরং তিনি বলেছেন যে, তিনি মহিলাকে আল্লাহ এর কিতাব অর্থাৎ আইন অনুযায়ী ১০০ বেত্রাঘাত করেছেন (যা সূরা নুরে উল্লেখ করা আছে) আর নবীর সুন্নত অনুসরণ করে রজম করেছেন। অর্থাৎ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার পর মুসনাদে আহমদের ২১৫৯৬ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত রজম সম্পর্কিত আয়াতের রজমের আইন বাতিল হয়ে গেছে ফলে আলী রাঃ বলেছেন যে তিনি রজম করেছেন নবীর সুন্নত হিসেবে অর্থাৎ কোরআনের কোন আয়াত অনুযায়ী আলী রাঃ রজম করেন নি অর্থাৎ ফরজ হিসেবে আলী রাঃ রজম করেন নি। ফরয হিসেবে আলী রাঃ ১০০ বেত্রাঘাত করেছেন।

আশ-শা'বী থেকে বর্ণিত যে, আলী বৃহস্পতিবার শুরাহাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং শুক্রবার তাকে পাথর মেরেছিলেন। তিনি (আলী রাঃ) বলেন: **আমি তাকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে বেত্রাঘাত করেছি এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুসারে পাথর মেরেছি।** (মুসনাদে আহমাদ ৮৩৯) (সাহিহ হাদিস, দারুস সালাম)

এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, বিবাহিত পুরুষ বা নারী যিনাহ করলে তার জন্য কোরআনে আল্লাহ এর আইন অনুযায়ী ফরয শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত। আর সুন্নত হিসেবে তাকে রজম করা যেতে পারে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, মাইজ বিন মালিক আল-আসলামী (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর কাছে বারবার আসলেন (যাতে তাকে তার পাপের শাস্তি দেওয়া হয়)। চতুর্থবার যখন তিনি এলেন, তখন নবী (সাঃ) রজমের নির্দেশ দিলেন এবং তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। এরপর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর কয়েকজন সাহাবী তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। একজন সাহাবী বললেন, "এই মৃত ব্যক্তি কতবার নবী (সাঃ)-এর কাছে এসেছিল এবং প্রতিবারই তিনি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যতক্ষণ না কুকুরের মতো পাথর মেরে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।" নবী (সাঃ) কিছু বললেন না এবং এগিয়ে গেলেন যতক্ষণ না তারা একটি গাধার মৃতদেহের কাছে এসে পৌঁছালেন যার পা বাতাসে ছিল (অর্থাৎ উপরের দিকে ছিল)। তিনি (সাঃ) তাদের বললেন, "এ (মৃতদেহ) থেকে কিছু খাও।" তারা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, এই মৃত গাধার (শরীর) থেকে?" তিনি তাদের বললেন, "তোমরা তোমার ভাইয়ের গীবত করেছো, এটা এর (গাধার) মৃতদেহ থেকে কিছু খাওয়ার চেয়েও গুরুতর। যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, সেই সত্তার শপথ, সে (মাইয বিন মালিক রাঃ) এখন জান্নাতের নদীতে ডুব দিচ্ছে।" (আল-আদাব আল-মুফরাদ ৭৩৭)

আলী রাঃ এর রজম করা সম্পর্কিত হাদিসগুলো থেকে এ কথাও নিশ্চিত রূপে বুঝা যায় যে, আল্লাহ এর রসূল যাদের রজম করেছিলেন তাদের তিনি সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার আগে করেছিলেন। কারণ আল্লাহ এর রসূল সাঃ কাউকে রজম করতে চাইতেন না, কেউ ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিতে আসলে তিনি মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতেন যা আমরা হাদিস থেকে দেখেছি। এছাড়া মুসনাদে আহমাদ ২১৫৯৬ হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াত ("বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।") সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাঃ এর মনোভাব আমরা শু'বার থেকে জানতে পারি যে, শুবা বলেছেন, "এটা এমন ছিল যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা অপছন্দ করতেন।" সুতরাং, আলী রাঃ এর রায় বা ফতোয়া অনুসারে, অবিবাহিত ও বিবাহিত উভয়ের জন্যই ফরয হিসেবে শুধু ১০০ বেত্রাঘাত শাস্তি হিসেবে আল্লাহ সূরা নুরে ঘোষণা করার পরও মুহাম্মাদ সাঃ কাউকে রজম করার নির্দেশ দিয়েছেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং, আল্লাহ এর রসূল সাঃ যাদেরকে রজম করার নির্দেশ দিয়েছেন তা তাদেরকে সূরা নূরের ২

নাম্বার আয়াত নাযিল হবার আগেই দিয়েছেন বলেই প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ এর রসূল সাঃ মাত্র ৪ বা ৫ জনের ব্যাপারে রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ২ জন ছিল ইহুদী যাদেরকে তাওরাত অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

আশ-শাইবানী থেকে বর্ণিত: আমি `আবদুল্লাহ বিন আবি `আওফাকে রজম (অবৈধ যৌন মিলনের জন্য কাউকে পাথর মেরে হত্যা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রজমের শাস্তি কার্যকর করেছিলেন," আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কি সূরা-নূর নাযিল হওয়ার আগে না পরে?" তিনি বললেন, "আমি জানি না।" (সহীহ আল-বুখারী ৬৮৪০; বইয়ে বই ৮৬, হাদিস ৬৩; অনুরূপ হাদিস বুখারি বই ৮৬, হাদিস নাম্বার -৪২)

আমরা এখন আশ – শাইবানীর প্রস্নের উত্তর পেলাম। উপরোক্ত আলোচনা শেষে আমার মতে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর নবী জীবিত থাকা অবস্থায় আর কোন ব্যভিচারীকে নবীর (সাঃ) বিচারের মুখোমুখি হতে হয়নি ফলে আল্লাহ এর রসূল সাঃ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর ব্যভিচারীকে কি শাস্তি দিতেন তা আমাদের কাছে হাদিস আকারে আসেনি। আর এজন্য আলী রাঃ এবং ওমর রাঃ এর ব্যভিচারী ব্যক্তির শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা পার্থক্য দেখতে পাই --- এটাও একটা প্রমান যে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর আল্লাহ এর রসূল সাঃ আর কোন ব্যভিচারীর বিচার করেন নি। যদি তিনি তা করতেন তবে আলী এবং ওমর বিবাহিত ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে আলাদা ফতোয়া বা রায় দিতেন না বরং উনারা ২ জন-ই নবী সাঃ এর উক্ত বিচারের ফয়সালা জানতেন এবং ২ জন সেইভাবে অর্থাৎ এক এবং অভিন্নভাবে ব্যভিচারীর বিচার করতেন। যারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন না তাদের জন্যঃ

ওমর রাঃ মুসনাদে আহমাদের ২১৫৯৬ হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াত (“বিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা যদি ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করবে।”) অনুযায়ী বিবাহিত ব্যভিচারীর বিচার কোরআনের উক্ত আয়াত অনুযায়ী ফরয হিসেবে পাথর মেরে করতে বলেছেন কিন্তু তিনি বেত্রাঘাতের কথা বলেন নি। ওমর রাঃ নিজে খলিফা হিসেবে ব্যভিচারীর যে বিচারের রায় দিয়েছেন সেখানেও বেত্রাঘাতের কথা নেই, আছে শুধু রজমের কথা। এমন কি তিনি বলেছেন যে, লোকেরা উনার সমালোচনা না করলে তিনি মুসনাদে আহমাদের ২১৫৯৬ হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতকে কোরআনের ভিতরে ঢুকিয়ে দিতেন। অন্য দিকে আলী রাঃ ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত অনুযায়ী অর্থাৎ আল্লাহ এর কিতাব অনুযায়ী বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য

নির্ধারিত শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত দিয়েছেন এবং নবীর সুন্নত হিসাবে রজম করেছেন। দেখা যাচ্ছে, ওমর রাঃ রজম করাকে আল্লাহ এর প্রদত্ত ফরয বলছেন এবং বেত্রাঘাত করছেন না কিন্তু আলী রাঃ বেত্রাঘাত করাকে আল্লাহ এর কিতাবে বর্ণিত ফরয হিসেবে গ্রহন করেছেন এবং রজম করাকে নবীর সুন্নত হিসেবে রায় দিয়েছেন। আলী এবং ওমরের রায়ে এরূপ পার্থক্যের ফলে প্রমাণিত হচ্ছে যে আল্লাহ এর রসূল সাঃ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর আর কোন ব্যভিচারীর বিচার করেন নি - যদি তিনি তা করতেন তবে আলী এবং ওমর উভয়ে উক্ত রায় সম্পর্কে জানতেন এবং সেভাবে রায় দিতেন ফলে বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তির রায়ের ব্যাপারে তাদের রায়ে কোন পার্থক্য দেখা যেত না।

এখন প্রশ্ন আসবে যে, আমরা কেন রজমের ব্যাপারে ওমর রাঃ, ওসমান রাঃ এর চেয়ে আলী রাঃ এর মতামত বা ফতোয়াকে বেশি প্রাধান্য দিবো ? এর কারণ হচ্ছে, হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রজমের ব্যাপারে আইন-কানুন ও শর্ত সমূহ আলী রাঃ, ওমর রাঃ এবং ওসমান রাঃ এর চেয়ে বেশি ভালো বুঝতেন। হাদিস সমূহ নিম্নরূপঃ

আলী ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণিত: আবু জুবিয়ান বলেন: উমরের কাছে এক মহিলাকে আনা হল যে ব্যভিচার করেছিল। তিনি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারার নির্দেশ দিলেন। ঠিক তখনই আলী পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে ধরে ফেলেন এবং ছেড়ে দেন। উমরকে খবর দেওয়া হয়। তিনি বলেন: আলীকে আমার কাছে আসতে বলো । আলী তার কাছে এসে বলেন: আমীরুল মুমিনীন, আপনি জানেন যে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: তিন ব্যক্তি আছেন যাদের আমল লিপিবদ্ধ করা হয় না: একজন ছেলে যতক্ষণ না সে বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায়, একজন ঘুমন্ত যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, একজন পাগল যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায়। এটি অমুকের পরিবারের একজন বোকা (পাগল) মহিলা। পাগলামির সময় কেউ তার সাথে এই কাজটি করে থাকতে পারে।
উমর বললেন: আমি জানি না। আলী বললেন: আমি জানি না। (সুনান আবু দাউদ ৪৪০২; মুসনাদে আহমাদের অনুরূপ হাদিসের শেষাংশ এরূপঃ ওমর (রাঃ) বললেন: আমি জানি না। তিনি ['আলী] বললেন: আমি জানি না। এবং তিনি (ওমর রাঃ) তাকে পাথর মারেননি। (মুসনাদে আহমাদ ১৩২৮; দারুস সালামঃ হাদিসটি আনুষঙ্গিক প্রমাণের ভিত্তিতে সহীহ এবং এর সনদ বিচ্ছিন্ন)

আলী ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণিত: ইবনে আব্বাস বলেন: উমরের কাছে এক পাগল মহিলা আনা হল, যে ব্যভিচার করেছিল। তিনি লোকদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং তাকে পাথর ছুঁড়ে মারার নির্দেশ দিলেন।

আলী ইবনে আবু তালিব পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন: এই (মহিলা) কী হয়েছে? তারা বললেন: ইনি এক পরিবারের একজন পাগল মহিলা। সে ব্যভিচার করেছে। উমর তাকে পাথর ছুঁড়ে মারার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বললেন: তাকে ফিরিয়ে নাও। তারপর তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন: আমিরুল মুমিনীন, আপনি কি জানেন না যে তিন ব্যক্তি আছেন যাদের আমল লিপিবদ্ধ করা হয় না: একজন পাগল যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে আসে, একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং একজন ছেলে যতক্ষণ না সে বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছায়?

তিনি বললেন: হ্যাঁ। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এই মহিলাকে পাথর ছুঁড়ে মারা হচ্ছে কেন?

তিনি বললেন: কিছুই নেই (কোন কারণ নেই)। তারপর তিনি (আলী) বললেন: তাকে ছেড়ে দিন। তিনি (উমর) তাকে ছেড়ে দিলেন এবং বলতে লাগলেন: আল্লাহ মহান। সুনান আবু দাউদ ৪৩৯৯ সহীহ (আল-আলবানী)

মালিক আমাকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি শুনেছেন যে উসমান ইবনে আফফানের কাছে এক মহিলাকে আনা হয়েছিল যার ছয় মাস পর সন্তান প্রসব হয়েছিল এবং তিনি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) তাকে বলেছিলেন, "সে এর যোগ্য নয়। আল্লাহ, পরম করুণাময়, তাঁর কিতাবে বলেছেন, 'তাদের গর্ভধারণ এবং দুধ ছাড়ানোর সময় ত্রিশ মাস', (সূরা ৪৬ আয়াত ১৫) এবং তিনি বলেছেন, 'যে কেউ স্তন্যপান সম্পূর্ণ করতে চায় তার জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর ধরে দুধ পান করাবে।' (সূরা ২ আয়াত ২৩৩) গর্ভাবস্থা ছয় মাস হতে পারে, তাই সে পাথর ছুঁড়ে মারার যোগ্য নয়।" উসমান ইবনে আফফান তাকে ডেকে পাঠালেন এবং দেখলেন যে তাকে (ঐ মহিলাকে) ইতিমধ্যেই পাথর ছুঁড়ে (হত্যা করা) হয়েছে।

(USC-MSA WEB ইংরেজি রেফারেন্স: মুয়াত্তা মালিক, বই ৪১, হাদিস ১১)

এখন আমরা দেখব, আলী রাঃ যে সুন্নত হিসেবে রজম করেছেন সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে করা যাবেঃ

সুন্নত হিসেবে রজম করার শর্ত সমূহঃ

১) যদি ব্যভিচারী ব্যাক্তি বিবাহিত হয় এবং নিজে স্বীকারোক্তি দেয়। সুন্নত হিসেবে কিছু করতে হলে সুন্নত পালনের শর্ত সমূহ পূর্ণ করতে হবে। রজমের ক্ষেত্রে, আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সুন্নত হচ্ছে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ মুসলিমদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা সবাই স্বেচ্ছায় ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি ছাড়া সুন্নত হিসাবে রজম করা যাবে না এর প্রমান আমরা পাই নিম্নের হাদিসগুলোতেঃ

আবু হুরায়রা এবং যায়েদ বিন খালিদ বর্ণনা করেছেন যে, দু'জন ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের কাছে বিবাদ নিয়ে এসেছিলেন। তাদের একজন বললেন, "আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করুন" এবং অন্যজন বললেন, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করুন এবং আমাকে কথা বলতে দিন।" তিনি বললেন, "আমার ছেলে, যে এই ব্যক্তির সাথে ভাড়াটে দাস ছিল, তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। যখন আমাকে বলা হল যে আমার ছেলেকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে হবে, তখন আমি তার মুক্তিপণ হিসেবে একশটি ভেড়া এবং আমার একটি দাসী দিয়েছিলাম; কিন্তু যখন আমি আলেমদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা বললেন যে আমার ছেলেকে একশটি বেত্রাঘাত করা উচিত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসিত করা উচিত, এবং পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা কেবল সেই ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য প্রযোজ্য।" আল্লাহর রাসূল বললেন, “যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আমি অবশ্যই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করব। তোমার ছাগল ও দাসী তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে, আর তোমার ছেলেকে একশ বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসিত করতে হবে। আর তুমি, উনাইস (উনাইস আল আসলামী), এই ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাও, **আর যদি সে স্বীকার করে তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করো।**” সে স্বীকার করে এবং সে তাকে পাথর মেরে হত্যা করে। মিশকাত আল-মাসাবিহ ৩৫৫৫ মুওয়াত্তা মালিক বই ৪১, হাদিস ৬; জামে আত-তিরমিযী ১৪৩৩ (বুখারী ও মুসলিম।)

আল্লাহ এর রসূল সাঃ উনাইস আল আসলামীকে রাঃ ঐ মহিলাকে রজম করার ব্যাপারে শর্ত দিয়েছিলেন যে, যদি সেই মহিলা স্বীকার করে যে সে ব্যভিচার করেছে তাহলেই যেন ঐ মহিলাকে রজম করা হয়। যদি ঐ মহিলা স্বীকার না করতেন তাহলে? হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ মহিলা স্বীকার না করলে তাকে রজম করা হত না যেহেতু আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) স্বীকারোক্তির শর্ত সাপেক্ষে রজম করতে বলেছিলেন। আলী রাঃ সুন্নত হিসেবে যেই মহিলার রজম করেছিলেন সেই মহিলাও নিজেই স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিয়েছিল যে সে ব্যভিচার করেছে। আল্লাহ এর রসূল সাঃ মুসলিমদের মধ্যে যাদের

ব্যাপারে রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা সবাই স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন যে, তারা ব্যভিচার করেছেন। হাদিস থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ উক্ত স্বীকারোক্তি দানকারী ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তি শুনতে চাইতেন না এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তাদেরকে যেন রজমের রায় থেকে বাঁচানো যায় সেই রূপ চেষ্টা করতেন। যেমনঃ

আবু সাঈদ বর্ণনা করেছেন যে আসলাম বংশের একজন ব্যক্তি, যাকে মাইজ বিন মালিক বলে ডাকা হত। মাইজ বিন মালিক রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেনঃ

আমি ব্যভিচার (ব্যভিচার) করেছি, তাই আমাকে শাস্তি দিন। আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাকে বারবার ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি লোকদের (তার মনের অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললঃ আমরা তার কোন ব্যাধির কথা জানি না (তবে) শুধু এই যে, সে এমন কিছু করেছে যার সম্পর্কে সে মনে করে যে, সে এর ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না যদি না তার উপর হাদ এর শাস্তি আরোপ করা হয়। তিনি (মাইজ) আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর কাছে ফিরে আসলেন এবং তিনি আমাদেরকে তাকে পাথর মারতে নির্দেশ দিলেন। আমরা তাকে বাকী'আল-গারকাদে (মদিনার কবরস্থান) নিয়ে যাই। আমরা তাকে বেঁধে রাখিনি বা তার জন্য কোনো গর্তও খনন করিনি। আমরা তাকে হাড়, মাটির ঢেলা ও নুড়ি দিয়ে আঘাত করেছি। সে পালিয়ে গেল এবং আমরা তার পিছনে দৌড়ালাম যতক্ষণ না সে পাথরের মাটিতে (আল-হাররা) এসে থেমে গেল এবং আমরা তাকে হাররার ভারী পাথর দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মারলাম যতক্ষণ না সে নিশ্চল হয়ে গেল (মারা গেল)। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতঃপর সন্ধ্যায় (আমাদেরকে) সম্বোধন করে বললেন, আমরা যখনই আল্লাহর পথে অভিযানে রওয়ানা হই, তখনই আমাদের সাথের কেউ একজন পুরুষ ছাগলের মতো (যৌন লালসার চাপে) চিৎকার করে ওঠে। এটা জরুরী যে, যদি এমন কোন ব্যক্তি আমার কাছে আসে, আমি তাকে শাস্তি দেব। তিনি তার (মাইজ ইবনে মালিকের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি বা তাকে অভিশাপ দেননি। (সহীহ মুসলিম ১৬৯৪ক)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাইজ ইবনে মালিককে বললেনঃ সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছিলে, বা চেপেছিলে বা দেখেছিলে। তিনি বললেনঃ না। তিনি বললেনঃ তুমি কি তার সাথে সহবাস/ সঙ্গম করেছিলে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। (উত্তরে) তিনি (নবী) আদেশ দিলেন যে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। বর্ণনাকারী "ইবনে আব্বাস থেকে" উল্লেখ করেননি। এটি ওয়াহবের সংস্করণ। (সুনানে আবি দাউদ ৪৪২৭)

বুরাইদাহ বলেছেন:

গামিদের এক মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বললঃ আমি ব্যভিচার করেছি। তিনি বললেনঃ চলে যাও। তিনি (মহিলা) ফিরে আসেন, এবং পরের দিন তিনি আবার তার কাছে আসেন এবং বললেন: সম্ভবত আপনি আমাকে ফেরত পাঠাতে চান যেমন আপনি মাইজ ইবনে মালিককে করেছিলেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি গর্ভবতী। তিনি তাকে বললেনঃ চলে যাও। তারপর তিনি (মহিলা) আবার আসেন এবং পরের দিন তার কাছে আসেন। তিনি (মুহাম্মাদ সাঃ) তাকে বললেনঃ তুমি সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত ফিরে যাও। তারপর তিনি ফিরে গেলেন। যখন তিনি একটি সন্তান প্রসব করলেন, তখন তিনি শিশুটিকে তার কাছে নিয়ে এসে বললেন: এই যে! আমি একে জন্ম দিয়েছি। তিনি (মুহাম্মাদ সাঃ) বললেনঃ ফিরে যাও এবং তাকে স্তন্যপান করাও যতদিন না তুমি তাকে দুধ ছাড়াবে। যখন সে তাকে দুধ ছাড়াল, তখন সে তাকে (ছেলেটিকে) তার হাতে কিছু দিয়ে নিয়ে এল যা সে খাচ্ছিল। তারপর ছেলেটিকে মুসলমানদের একজন নির্দিষ্ট লোকের কাছে দেওয়া হল এবং তিনি (রাসূল) তার সম্পর্কে আদেশ করলেন। সুতরাং, তার জন্য একটি গর্ত খনন করা হল, এবং তিনি তার সম্পর্কে আদেশ দিলেন এবং তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। যারা তাকে ঢিল ছুড়ছিল তাদের একজন ছিল খালিদ। সে তার দিকে একটি পাথর ছুড়ে মারে। (ফলে) তার গালে (মহিলার) এক ফোঁটা রক্ত পড়লে সে (খালিদ) তাকে গালি দেয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ খালিদ ভদ্রভাবে! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, তিনি এতটাই অবহিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত ট্যাক্স নেয় সে যদি এই পরিমাণ অনুতপ্ত হয় তবে তাকে ক্ষমা করা হবে। অতঃপর (মুহাম্মাদ সাঃ) তার সম্পর্কে আদেশ প্রদান করেন এবং তার জন্য দোয়া করেন এবং তাকে দাফন করা হয়।(সুনানে আবু দাউদ ৪৪৪২)

আলী (রাঃ) আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) এই সুন্নতটি পালন করেছিলেন। তিনি একজন মহিলার ব্যাপারে রজমের আদেশ দিয়েছিলেন যিনি স্বেচ্ছায় ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। আলী (রাঃ) নবী সাঃ এর মত মহিলাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে রজমের রায় থেকে বাচাতে চেয়েছিলেন বলে হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়। যেমনঃ

আশ-শা'বী থেকে বর্ণিত যে, আলী (রাঃ) শুরাহাকে বললেন:

হয়তো তোমাকে জোর করা হয়েছিল? হয়তো তোমার স্বামী তোমার কাছে এসেছিল? হয়তো...? সে বলল: না। যখন সে সন্তান প্রসব করল, তখন সে (আলী রাঃ) তাকে পেটাতে শুরু করল, তারপর

পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলল। উনাকে বলা হল: আপনি কেন তাকে বেত্রাঘাত করলেন এবং তারপর পাথর ছুঁড়ে মারলেন? তিনি (আলী রাঃ) বললেন: আমি তাকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বেত্রাঘাত করেছি এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুযায়ী তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছি। (মুসনাদে আহমাদ ১৩১৭)

আশ-শা'বী থেকে বর্ণিত যে, শুরাহা আল-হামদানিয়্যাহ আলী (রাঃ) এর কাছে এসে বললেন: আমি যিনা করেছি। (আলী রাঃ তাকে বললেন,) সম্ভবত তুমি ঈর্ষান্বিত, অথবা হয়তো তুমি কিছু স্বপ্ন দেখেছ, অথবা হয়তো তোমাকে জোর করা হয়েছে? (সুরাহা উত্তরে "না" বললেন) তাই তিনি (আলী) বৃহস্পতিবার তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং শুক্রবার তাকে পাথর মেরেছিলেন এবং তিনি (আলী রাঃ) বলেছিলেন: আমি তাকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে বেত্রাঘাত করেছি এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাহ অনুসারে পাথর মেরেছি।(মুসনাদে আহমাদ ১১৮৫)

বুঝা গেলো, সুন্নত হিসেবে মুসলিমদের কাউকে রজম করতে হলে আল্লাহ এর রসূল সাঃ যে ক্ষেত্রে রজম করেছিলেন শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই রজম করা যাবে অর্থাৎ কেউ যদি স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দেয় যে সে ব্যভিচার করেছে। এখানে বুঝার বিষয় হচ্ছে যখন সুন্নত হিসেবে রজম করা হচ্ছে তখন আল্লাহ এর রসুলকে সাঃ সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ উনি যে ক্ষেত্রে রজমের আদেশ দিয়েছেন শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই রজমের নির্দেশ দেয়া যাবে। অন্য ক্ষেত্রে দেয়া যাবে না কেন? কারণ আল্লাহ রসূল সাঃ যা করেছেন তা হচ্ছে সুন্নাহ। আল্লাহ এর রসূল সাঃ সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে কোন মুসলিমকে রজম করেন নি তাই কোন মুসলিমকে সাক্ষীর ভিত্তিতে রজম করা সুন্নতের ভিতরে পড়ে না। তেমনিভাবে, কোন মহিলাকে গর্ভবতী হবার কারণে রজম করা যাবে না কারণ এই কাজটিও আল্লাহ এর রসূল সাঃ করেন নি। সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের আগে সাক্ষি এবং গর্ভ ধারণের ভিত্তিতে যদি রজম করা হত তাহলে তা হত মুসনাদে আহমদের হাদিসে বর্ণিত কোরআনের আয়াতের ভিত্তিতে রজম করা - যা করা তখন ফরয ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ সাঃ যেহেতু কোন মুসলিমকে সাক্ষ্য বা গর্ভ ধারণের ভিত্তিতে রজম করেন নি তাই সাক্ষ্য এবং গর্ভ ধারণের ভিত্তিতে কোন মুসলিমকে রজম করা সুন্নতের ভিতরে পড়বে না। সুতরাং কোন মুসলিমকে শুধুমাত্র স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই সুন্নত হিসেবে রজম করা যাবে যা আলী রাঃ করেছিলেন।

তাহলে, ওমর এবং ওসমান যে গর্ভবতী হবার কারণে রজমের আদেশ দিয়েছিলেন? ওমর রাঃ এবং ওসমান রাঃ উভয়েই মুসনাদে আহমদের হাদিসে উল্লেখিত কোরআনের আয়াতের ভিত্তিতে রজমের আদেশ দিয়েছিলেন। উনারা সুন্নত হিসেবে রজমের আদেশ দেন নি, উনারা মুসনাদে আহমদে বর্ণিত

কোরআনের আয়াতের ভিত্তিতে অর্থাৎ ফরয হিসেবে রজমের আদেশ দিয়েছিলেন। আশা করি, পার্থক্যটা বুঝা গেছে। যদি কোন ইহুদী শরিয়া আইন বলবত থাকা কোন মুসলিম ভূখণ্ডে থাকে এবং ব্যভিচার করে এবং যদি সে তাওরাত অনুযায়ী ফয়সালা চায় তাহলে তাকে, নবীর সুন্নত হিসেবে, ৪ জন সাক্ষীর প্রমাণের ভিত্তিতে তাওরাত অনুযায়ী রজমের নির্দেশ দেয়া যাবে যেরূপ মুহাম্মাদ সাঃ করেছিলেন। কিন্তু সেই ইহুদী যদি কোরআনের ভিত্তিতে ফয়সালা চায় তাহলে তাকে রজম করা যাবে না কারণ এটা আল্লাহ এর রসূল সাঃ যে ঘটনায় ২ জন ইহুদীকে রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন তার সাথে মিলছে না। অর্থাৎ সুন্নাহের সাথে মিলছে না।

২) স্বেচ্ছায় যে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিবে সে যদি বলে যে, কোন কিছু তাকে এই কাজে প্ররোচিত করেছে তাহলেও তাকে রজম করা যাবে না। এটা শর্তটা আমরা আলী রাঃ এর হাদিস থেকে পাই।

আশ-শা'বী থেকে বর্ণিত যে, শুরাহা আল-হামদানিয়্যাহ আলী (রাঃ) এর কাছে এসে বললেন: আমি যিনা করেছি। (আলী রাঃ তাকে বললেন) সম্ভবত তুমি ঈর্ষান্বিত, অথবা হয়তো তুমি কিছু স্বপ্ন দেখেছ, অথবা হয়তো তোমাকে জোর করা হয়েছে? (সুরাহা উত্তরে "না" বললেন) তাই তিনি (আলী) বৃহস্পতিবার তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং শুক্রবার তাকে পাথর মেরেছিলেন এবং তিনি (আলী রাঃ) বলেছিলেন: আমি তাকে আল্লাহর কিতাব অনুসারে বেত্রাঘাত করেছি এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুসারে তাকে পাথর মেরেছি।(মুসনাদে আহমাদ ১১৮৫)

অর্থাৎ কোন স্বীকারোক্তি দিতে আসা ব্যভিচারী যদি বলে যে, সে ঈর্ষান্বিত অর্থাৎ অন্য মেয়ে বা মহিলারা তাদের স্বামীর সাথে সহবাস করে কত মজা পাচ্ছে কিন্তু সে তার কিছুই পাচ্ছে না, এজন্য সে ঈর্ষান্বিত হয়ে এই কাজ করেছে বা এই রকম অন্য কোন ঈর্ষা তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ করে দিয়েছিল তাই সে এই কাজ করেছে তাহলে তাকে রজম করা যাবে না। অথবা যদি বলে যে, সে স্বপ্নে দেখেছে যে কেউ তাকে উক্ত ব্যক্তির সাথে সহবাস করতে বলেছে বা বলেছে যে উক্ত ব্যক্তির সাথে সহবাস না করলে তার ক্ষতি হবে তাই সে ভয়ে উক্ত ব্যক্তির সাথে সহব্যাস করেছে তাহলেও তাকে রজম করা যাবে না, অথবা সে যদি বলে যে, তাকে কেউ ভয় দেখিয়েছে বা কেউ তাকে জোর করে ধর্ষণ করেছিল কিন্তু লজ্জায় সে তখন বলতে পারেনি বা ভয়ে বলতে পারেনি তাহলেও তাকে রজম করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যভিচারী সত্য বলেছে না মিথ্যা বলেছে তা যাচাই করে দেখা হবে না বা অধিকতর তদন্ত করা হবে না (***) কিন্তু তাকে রজমের নির্দেশ দেয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ঈর্ষা বা স্বপ্নের কথা বললে তো যাচাই করে দেখার কোন সুযোগও নেই। উক্ত হাদিস পড়ে বুঝলাম যে, যদি স্বীকারোক্তি দানকারী ব্যভিচারীর কথায়

বুঝা যায় যে, শুধুমাত্র হারাম যৌন আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কিছু তাকে উক্ত কাজে প্ররোচিত করেছে তাহলে তাকে রজম করা যাবে না।

৩) স্বীকারোক্তি দানকারী ব্যভিচারী ব্যক্তি যে কোন সময় তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতে পারবেন এবং সেই ক্ষেত্রে তাকে রজম করা বা পাথর নিক্ষেপ করা সাথে সাথেই বন্ধ করে দিতে হবে।

নুয়াইম ইবনে হুজ্জাল থেকে বর্ণিত:

ইয়াজিদ ইবনে নুআইম ইবনে হুজ্জাল তার পিতার বরাতে বলেছেন: এতিম মাইজ ইবনে মালিক আমার পিতার আশ্রয়ে ছিলেন। তিনি এক গোত্রের / বংশের এক দাসীর সাথে অবৈধ যৌন সঙ্গম করেছিলেন। আমার পিতা তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে যাও এবং তুমি যা করেছ তা তাকে জানাও, কারণ তিনি হয়তো আল্লাহর কাছে তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। (নবীর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে) তার উদ্দেশ্য ছিল এই আশাই যে এটি তার জন্য (আল্লাহ এর শাস্তি থেকে) মুক্তির উপায় হতে পারে।

অতঃপর তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বললেনঃ আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি, তাই আমাকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি দিন। তিনি (রাসূলুল্লাহ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, অতঃপর তিনি (মাইজ) ফিরে এসে বললেনঃ আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি, তাই আমাকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি দিন। তিনি (সাঃ) (আবার) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, অতঃপর তিনি (মাইজ) ফিরে এসে বললেনঃ আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি, তাই আমাকে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি দিন।

যখন তিনি চারবার (এই কথা) উচ্চারণ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি চারবার বলেছ। তুমি কার সাথে এটা করেছ?

তিনি উত্তর দিলেনঃ অমুকের সাথে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি তার সাথে শুয়েছিলে? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার ত্বক কি তার সাথে লেগেছিল? তিনি উত্তর দিলেন। হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি তার সাথে সঙ্গম করেছ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তাই তিনি (রাসূল সাঃ) তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তারপর তাকে হাররাহের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে পাথর মারার সময় সে পাথরের আঘাত (ব্যথা) অনুভব করে এবং তা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যায়। যারা তাকে পাথর মেরেছিল তারা তাকে ধরতে পারেনি কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) তার কাছে চলে গেলেন । তিনি উটের সামনের পায়ের হাড় তার দিকে ছুঁড়ে মারেন, যা তাকে

আঘাত করে এবং তাকে হত্যা করে। অতঃপর তারা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে (পুরো) ঘটনাটি উনাকে জানায়।
তিনি বললেনঃ তোমরা তাকে একা ছেড়ে দিলে না কেন? হয়ত সে অনুতপ্ত হত এবং আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতেন। (সুনান আবু দাউদ ৪৪১৯; মিশকাত আল-মাসাবিহ ৩৫৮১; অনুরূপ হাদিস জামে আত তিরমিজি ১৪২৮)

উপরোক্ত হাদিস থেকে বুঝা গেলো যে, ব্যভিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন-ই তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করবে তখন-ই তাকে রজম করা বা পাথর নিক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।
(***) আল্লাহ এর রসূলের সাঃ রজমের হাদিসগুলো থেকে এই বিষয়টাও পরিষ্কার যে, অধিকতর তদন্ত করে ব্যভিচারে বা যিনায় লিপ্ত হওয়া ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া সুন্নতের ভিতরে পড়ে না। যেমনঃ মুহাম্মাদ (সাঃ) যে দাসীর সাথে মাইজ রাঃ ব্যভিচার করেছিলেন তাকে ডেকে আনেন নি বা তার ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞেসও করেন নি। গামিদের মহিলা কার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল তা মুহাম্মাদ সাঃ জানতে চান নি বা তাকে ডেকে নিয়ে আসেন নি বা তার ব্যাপারে তদন্ত করতে বা সাক্ষী খুঁজতে বলেন নি। এই বিষয়টা আমরা আলী রাঃ এর রজমের বিচার করার সময়ও দেখেছি। তিনিও সুরাহা কার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল তাকে খুঁজে বের করে আনেন নি বা তার সম্পর্কে কোন কথাও বলেন নি। এখান থেকে বুঝা গেলো কাউকে তদন্ত করে যিনাহ বা ব্যভিচারের অভিযোগে অভিজুক্ত করা খলিফা বা মুসলিম সরকারের কাজ নয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনাহ বা ব্যভিচারের অভিযোগ করে তখন খলিফা বা মুসলিম সরকার এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখবে যে, অভিযোগ সত্য না মিথ্যা।

৪) ব্যভিচারে স্বীকারোক্তি দিতে আসা ব্যক্তিকে স্বীকারোক্তি দেবার আগেই জানাতে হবে যে, যদি সে স্বীকারোক্তি দেয় তাহলে তার উপর আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সুন্নত অনুসরণ করে রজম করা হতে পারে।
জাবির (রাঃ) আবদুর রহমান বিন আবযা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রাঃ) বলেন, ‘আমি নবী (সাঃ) এর সাথে বসে ছিলাম, তখন মাইজ বিন মালিক (রাঃ) এসে তার সামনে একবার (ব্যভিচারের) স্বীকারোক্তি দিলেন এবং (মুহাম্মাদ সাঃ) তাকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি এসে দ্বিতীয়বার তার সামনে স্বীকারোক্তি করলেন এবং (মুহাম্মাদ সাঃ) তাকে তাড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি

এসে তৃতীয়বার তার (মুহাম্মাদ সাঃ) সামনে স্বীকারোক্তি করলেন এবং (মুহাম্মাদ সাঃ) তাকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি তাকে বললাম: যদি তুমি চতুর্থবার স্বীকারোক্তি করো, তাহলে উনি (মুহাম্মাদ সাঃ) তোমাকে পাথর মারবেন। তারপর তিনি (মাইজ) চতুর্থবার স্বীকারোক্তি করলেন, তাই তিনি (মুহাম্মাদ সাঃ) তাকে আটক করে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল: আমরা তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। তারপর তিনি (মুহাম্মাদ সাঃ) তাকে (মাইজকে) পাথর মারার নির্দেশ দিলেন। (মুসনাদে আহমাদ ৪১; হাদিসের গ্রেড: সহীহ লিগহারিহি, কিন্তু জাবির আল-জু'ফি এর দুর্বলতার কারণে এই হাদিসটির সনদ যঈফ(দারুস সালাম)।সহিহ লিগহারিহি হচ্ছে এমন হাদিস যা নিজে সনদের কারণে যইফ কিন্তু বাহ্যিক কারণে সহীহ)

গামিদের যে মহিলাকে (রাঃ) মুহাম্মাদ সাঃ রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি মাইজ বিন মালিকের (রাঃ) ঘটনা জানতেন। অর্থাৎ ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিলে রজম করা হবে এটা ঐ মহিলা জানতেন। ইহুদীদের মুহাম্মাদ সাঃ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রজম করেন নি তাই তাদেরকে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিলে যে রজম করা হবে তা পূর্ব থেকে জানানোর প্রয়োজন ছিল না। ইহুদীদের মুহাম্মাদ সাঃ রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত অনুসারে।

৫) যে সমাজে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সুন্নত হিসেবে রজম করার বিধান রাখা হবে সেই সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ অর্থাৎ ৪ জন স্ত্রী রাখা এবং কোনো নারীর জন্য তার স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করাটা খুব স্বাভাবিক নিত্য দৈনন্দিন কাজের মত একটি কাজ হতে হবে। যেমনঃ আমরা প্রতিদিন খাবার খাই - এরূপ একটি ব্যাপার হবে পুরুষের জন্য ৪ জন স্ত্রী রাখা এবং একজন নারীর জন্য তার স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করা।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

বারিরার স্বামী ছিলেন মুগীস নামক একজন ক্রীতদাস, যেন আমি এখন তাকে দেখতে পাচ্ছি, বারিরার পিছনে পিছনে যাচ্ছিল এবং তার দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। নবী (সাঃ) আব্বাসকে বললেন, "হে আব্বাস! বারিরার প্রতি মুগীসের ভালোবাসা এবং মুগীসের প্রতি বারিরার ঘৃণা দেখে কি তুমি অবাক হও না?" নবী (সাঃ) তখন বারিরার দিকে তাকালেন, "তুমি কেন তার কাছে ফিরে যাও না?" তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি কি আমাকে তা করার আদেশ দেন?" তিনি বললেন, "না, আমি

কেবল তার জন্য সুপারিশ করছি।" তিনি (বারিরা) বললেন, "তাকে (মুগীসকে) আমার প্রয়োজন নেই।" (সহীহ আল-বুখারী ৫২৫১)

একজন স্ত্রীর শারীরিক চাহিদা যদি তার স্বামী মিটাতে না পারে তাহলে স্ত্রী যেন সহজেই সেই স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য একজন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে যে তার শারীরিক চাহিদা মেটাতে পারবে। যদি সমাজ এমন হয় যে, কোন মেয়ে তালাক দিলে তাকে আর কেউ বিয়ে করতে চায় না তাহলে সেই স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক না দিয়ে সংসার করতে থাকবে কিন্তু তার শারীরিক চাহিদা পূরণ হবে না ফলে সেই স্ত্রীর ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল এবং এই ক্ষেত্রে তাকে পুরোপুরি দোষ দেয়া যায় না কারণ সমাজে যদি তালাকপ্রাপ্ত নারীদের সহজে স্বামী পাবার সুযোগ থাকত তাহলে সে তার স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করে নিত যে তার চাহিদা পূর্ণ করতে পারত ফলে সে ব্যভিচারে পড়ত না। আবার একজন অবিবাহিত পুরুষ একজন তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিয়ে করতে চায় না সুতরাং একজন পুরুষ যদি ৪ জন স্ত্রী রাখার সুযোগ পায় তাহলেই কেবল তালাকপ্রাপ্ত নারীরা সহজে স্বামী খুঁজে পাবে কারণ যে পুরুষের একজন বা দু'জন স্ত্রী আছে সেই লোক-ই একজন তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিয়ে করবে, অবিবাহিত পুরুষরা তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিয়ে করবে এমন সম্ভাবনা কম।

সহীহ আল-বুখারী ৫২৫১ হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে এটা বুঝাতে যে নবীর সময়ে নারীরা কত সহজে তালাক দিতে পারত। বারিরা (রাঃ) এবং মুগিস (রাঃ) এর ঘটনায় শারীরিক চাহিদা সম্পর্কিত কিছু নেই। সুতরাং যে সমাজে নারীরা সহজে স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্য স্বামী গ্রহন করতে পারে না সেই সমাজে এবং যেই সমাজে পুরুষরা একের অধিক স্ত্রী সহজে রাখতে পারে না সেই সমাজে সুন্নত হিসাবে রজম করা যাবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেলো যে, শুধুমাত্র ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সুন্নত হিসেবে তাকে রজম করা যাবে অন্য কোন ক্ষেত্রে যেমন ৪ জন সাক্ষী বা গর্ভবতী হওয়ার কারণে কাউকে রজম করা যাবে না। তবে ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাকে সুন্নত হিসেবে রজম করতে হলে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই ইসলামী শরিয়া আইন পরিপূর্ণরূপে কার্যকর আছে এমন রাষ্ট্রে প্রকাশ্য কোর্টে এসে স্বেচ্ছায় জন-মানুষের বলতে হবে যে, সে ব্যভিচার করেছে এবং এই কাজে তাকে অন্য কোন কিছু (যেমনঃ ভয়ভীতি, ঈর্ষা, জোরপূর্বক, স্বপ্ন) প্ররোচিত করেনি এবং সে জানে যে, স্বীকারোক্তি দিলে তাকে নবীর সুন্নত হিসেবে রজম করা হতে পারে এবং সে নিজেই চায় যে, তাকে

রজম করা হোক। তারপর বিচারক তাকে নবীর সুন্নত হিসেবে রজমের নির্দেশ দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন। এটা এখন বিচারকের ইচ্ছা। এরূপ সতর্কতার কারণ কি?

১) রজম সম্পর্কিত যে আয়াতটি বা আইনটি আমরা মুসনাদে আহমদের হাদিসে পেয়েছি তা এখন বাতিল হয়ে গেছে। এটা আমরা আলী রাঃ এর ফতোয়া বা রায় থেকে বুঝতে পারি কারণ আলী রাঃ রজম করেছিলেন নবীর সুন্নত হিসেবে, ফরয হিসেবে নয়।

২) মুহাম্মাদ সাঃ যে সকল মুসলিমদের রজম করেছিলেন তাদের স্বীকারোক্তি তিনি নিতে চাইতেন না। যেমন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন বা চলে যেতে বলতেন; তিনি কাউকে খুঁজে বের করে এনে যিনাহ বা ব্যভিচারের শাস্তি দেন নি। তিনি উনাইস ইবনে আসলামীকে শর্ত দিয়েছিলেন যে,” যদি ঐ ব্যক্তির স্ত্রী স্বীকারোক্তি দেয় তাহলে যেন তাকে রজম করা হয়"।
৩) মাইজের রাঃ হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, লোকেরা তার সম্পর্কে বলেছিল যে, "সে এমন কিছু করেছে যার সম্পর্কে সে মনে করে যে, সে এর ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না যদি না তার উপর হাদ (রজমের) এর শাস্তি আরোপ করা হয়" (সহীহ মুসলিম ১৬৯৪ক)। গামিদের মহিলাও (রাঃ) মুহাম্মাদ সাঃ কে বলেছিলেন যে, "সম্ভবত আপনি আমাকে ফেরত পাঠাতে চান যেমন আপনি মাইজ বিন মালিককে করেছিলেন।”(সুনানে আবু দাউদ ৪৪৪২) যাতে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলা নিজেই চাচ্ছিলেন যে, তার উপর রজম করা হোক। সুতরাং, সুন্নত হিসাবে রজমের আদেশ দিতে হলে এই শর্তটা পূরণ করতে হবে যে, ব্যভিচারী ব্যক্তি নিজেকেই বলতে হবে যে, সে চায় তার উপর রজম করা হোক। এই রূপ দাবী করার পরও মাইজের মত সে যদি পাথরের আঘাত সহ্য না করতে পেরে নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে তাহলে তাকে আর একটি পাথরও মারা যাবে না। তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিতে হবে। এটা আমরা মাইজের রাঃ হাদিস থেকে বুঝতে পারি (সুনান আবু দাউদ ৪৪১৯)।

আমি এতক্ষন যে আইনগুলো বলেছি তা তাদের জন্য যারা আমার সর্বশেষ প্রমান মানবেন না। আল্লাহ চাইলে, এই বইয়ে কোরআন হাদিস থেকে দেয়া সর্বশেষ প্রমান এটাই প্রমাণিত করবে যে, সূরা নূর নাযিলের পর ইসলামে আর রজমের বিধান নেই, সুন্নত হিসেবেও কেউ এখন আর রজম করতে পারবেন না বা রজমের নির্দেশ দিতে পারবেন না। রজমের বিধান আল্লাহ বাতিল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ কেন রজমের বিধান বাতিল করেছেন তা আল্লাহ সূরা নূরে বলেও দিয়েছেন।

এখন আমরা সূরা নুর থেকে বুঝতে চেষ্টা করব বিবাহিত ব্যভিচারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ কি শাস্তি সূরা নূরে দিয়েছেন, তারপর আমরা এ সম্পর্কিত হাদিস পড়ব।

"এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।(১) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২) (সূরা নুর আয়াত -১-২)
এই আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা এই বইয়ে পূর্বেই করা হয়েছে যেখান থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, সূরা নূরের প্রথম আয়াতে "এটি একটি সূরা" বলার মাধ্যমে আল্লাহ সূরা নূরে উল্লেখিত ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত যে মুসনাদে আহমদে উল্লেখিত আয়াত থেকে মর্যাদায় অধিক মর্যাদা সম্পন্ন তা বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং উভয় আয়াতের মধ্যে মর্যাদার বিষয়টি তুলনার মাধ্যমে আল্লাহ এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এখন আমি যা নাযিল করবো তা পূর্বে নাযিল করা আয়াতের আইনকে বাতিল করে নতুন আইন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে আর এখন থেকে এটাই হবে বিবাহিত এবং অবিবাহিত সকল ব্যভিচারীর জন্য একমাত্র শাস্তি।
সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার পর রজমের বিধান যে বাতিল হয়ে গেছে এবং সুন্নত হিসেবেও যে আর রজম করা যাবে না - তার প্রমান নিম্নের হাদিসটিঃ

আন-নুমান বিন বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) একজন ব্যক্তির তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সহবাসের/সঙ্গমের (শাস্তির) ব্যাপারে বলেছেন। (মুহাম্মাদ সাঃ বলেছেন,) "যদি সে (দাসী) তাকে (ঐ ব্যক্তিকে) তা করতে দেয় তবে আমি তাকে (ঐ ব্যক্তিকে) একশত বেত্রাঘাত করব, এবং যদি সে (দাসী) তাকে অনুমতি না দেয় তবে আমি তাকে (ঐ ব্যক্তিকে) পাথর মেরে (হত্যা করে) ফেলব।" সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬০ গ্রেড: হাসান (দারুস সালাম) সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬২ গ্রেড হাসান (দারুস সালাম)।

উক্ত হাদিসে নবীর সাঃ যে রায় আমরা পাচ্ছি তা সম্ভবত সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার পরের কোন সময়ের হাদিস। উক্ত হাদিসে এই রকম রায় বা শাস্তি দেবার অন্য কোন কারণ আমি খুঁজে

পাই না। যদি সেই কৃতদাসী মহিলা উক্ত লোককে নিজের সাথে সঙ্গম করার অনুমতি দিয়ে থাকে তাহলে এটা শুধু যিনাহ হবে, ধর্ষণ হবে না। এই ক্ষেত্রে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতের শাস্তি আল্লাহ এর রসূল সাঃ উক্ত ব্যক্তিকে দেয়ার কথা বলেছেন কিন্তু রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করার কথা বলেন নি। এই হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ যিনাহের যে শাস্তির কথা বলেছেন তা বিবাহিত ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য হবে এবং রজমের আইনটি বাতিল হয়ে গেছে। অন্যদিকে যদি কৃতদাসীটি উক্ত লোকটিকে নিজের সাথে সঙ্গম করার অনুমতি না দিয়ে থাকে তাহলে এটি একটি ধর্ষণ যার জন্য ইসলামে শাস্তি হচ্ছে পাথর নিক্ষেপে হত্যা অর্থাৎ রজম।

হাবীব বিন সালিম থেকে বর্ণিত যে,

“এক ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সহবাস/সঙ্গম করেছিল তাকে নু’মান বিন বশীর (রাঃ)-এর কাছে আনা হল, তিনি বললেনঃ আমি রাসুলুল্লাহের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেয়া রায় থেকে অন্য কোন রায় দেব না, তিনি বললেনঃ যদি (ক্রীতদাসীটি) তাকে (নিজেকে) তার (ঐ লোকের) জন্য হালাল করে থাকে তবে আমি তাকে একশত বেত্রাঘাত করব, কিন্তু সে অনুমতি না দিলে আমি তাকে (ঐ লোককে) পাথর মারব। (সুনানে ইবনে মাজাহ ২৫৫১; গ্রেড হাসান; দারুস সালাম)

হাবিব বিন সালিম বলেন,

"আন-নু'মান বিন বশীরের কাছে একজন লোককে আনা হল যে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সম্পর্ক (সঙ্গম) করেছিল, সে (নুমান বিন বশীর রাঃ) বলল: 'আমি তোমাকে তার মামলার বিষয়ে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রায় অনুসারে রায় দিচ্ছি: যদি সে তাকে তার জন্য হালাল করে থাকে তবে আমি তাকে একশত বার বেত্রাঘাত করব এবং যদি সে তাকে হালাল না করে থাকে তবে আমি তাকে পাথর মারব।(জামি আত তিরমিযী ১৪৫১)

এই হাদিসটি সম্ভবত আলী রাঃ জানতেন না কারণ নুমান বিন বশীর (রাঃ), ওসমান (রাঃ) মারা যাবার পরে মুয়াবিয়ার পক্ষে ছিলেন এবং আলীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নুমান বিন বশীর রাঃ মুয়াবিয়ার দলেই ছিলেন। সুতরাং, আলীর সাথে নুমান বিন বশীরের বেশি কথা হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। আলী রাঃ কুফায় ঐ মহিলার রজম করেছিলেন। তখন খুব সম্ভবত নুমান বিন বশীর রাঃ কুফায় ছিলেন না কারণ ঐ সময় নুমান বিন বশীর রাঃ ছিলেন মুয়াবিয়ার দলে তাই কুফা - যেটা ছিল আলীর মূল ঘাঁটি সেখানে নুমান বিন বশীরের রাঃ থাকার কথা নয়।

ইয়াজিদের মৃত্যুর পর নুমান বিন বশীর রাঃ উমাইয়াদের ছেড়ে দিয়ে আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের রাঃ দলে যোগ দেন এবং আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরকে খলিফা হিসেবে বায়াত দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি উমাইয়াদের হাতে নিহত হন। সুতরাং নুমান বিন বশীর রাঃ এমন একজন সাহাবী যিনি ফিতনার সময় শেষ পর্যন্ত সঠিক দলে যোগদান করতে পেরেছিলেন।

বিবাহিত ব্যক্তিকে ব্যভিচার করার কারণে রজম করা হবে না শুধু ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে - এই সম্পর্কিত নুমান বিন বশিরের বর্ণিত হাদিসটি খুব বেশি মানুষের বা সাহাবীর জানার কথা নয় কারণ উক্ত ঘটনা তখনো ঘটেনি। যদি আল্লাহ এর রসূল সাঃ এরূপ কোন বিচার করতেন তাহলে অনেক সংখ্যক সাহাবী বিষয়টা জানতেন; ওমর, ওসমান, আলীও বিষয়টা জানতেন, কিন্তু এই রূপ ঘটনা ঘটেনি, আল্লাহ এর রসূল সাঃ সম্ভবত কিছু সাহাবীকে বা একান্ত আলাপে নুমান বিন বশীরকে রাঃ জানিয়ে গিয়েছিলেন যে, বিবাহিত ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার শাস্তি কি হবে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মাইজ বিন মালিক উনার অধিকারভুক্ত নয় এমন একজন কৃতদাসীর সাথেই সঙ্গম করেছিলেন ফলে উনাকে রজম করা হয়েছিল। কিন্তু সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর বিবাহিত যিনাহকারীদের জন্যও আইন পাল্টে গিয়েছে তাই উক্ত হাদিসে (সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬০) আল্লাহ এর রসূল সাঃ রজমের কথা আর বলেন নি। তবে বিবাহিত ব্যক্তির ধর্ষণের ক্ষেত্রে আইন হচ্ছে রজম।
এখন ইসলামে ধর্ষণের শাস্তি কি - তা আমরা হাদিস থেকে জেনে নেই।

ওয়াইল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়, একজন মহিলা নামাজের জন্য বের হলেন, তখন এক ব্যক্তি তাকে আক্রমণ করল এবং তাকে জোর করে ধর্ষণ করল।
সে (মহিলা) চিৎকার করল তাই সে (লোকটি) চলে গেল, আর যখন একজন পুরুষ সেদিকে এলো সে (মহিলাটি) বলল: ঐ ব্যক্তি আমার সাথে এমন এমন (কাজ) করেছে। আর যখন মুহাজিরদের একটি দল এলো, তখন সে বলল: ঐ ব্যক্তি আমার সাথে এমন এমন (কাজ) করেছে। তারা গিয়ে সেই ব্যক্তিকে ধরলো যাকে তারা মনে করেছিল যে তার (মহিলার) সাথে সঙ্গম করেছে এবং তাকে তার (মহিলার) কাছে নিয়ে আসল।

সে (মহিলাটি) বলল: হ্যাঁ, এই সে। তারপর তারা তাকে (ঐ লোককে) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কাছে নিয়ে গেল।

যখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাঃ) রায় ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন, তখন যে ব্যক্তি (আসলে) তাকে (মহিলাকে) নির্যাতন করেছিল সে দাঁড়িয়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমিই সেই ব্যক্তি যে তার সাথে এটা করেছে।

তিনি (রাসূলুল্লাহ সাঃ) তাকে (মহিলাকে) বললেন: যাও, কারণ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু তিনি লোকটিকে কিছু ভালো কথা বললেন (আবু দাউদ বলেছেন: যাকে ধরে আনা হয়েছিল তাকে), এবং যে লোকটি তার (মহিলার) সাথে (জোরপূর্বক) সহবাস/সঙ্গম করেছিল, তার সম্পর্কে তিনি বললেন: তাকে পাথর মেরে হত্যা করো।

তিনি আরও বললেন: সে (ধর্ষণকারী ব্যক্তি) এরূপ তওবা করেছে যে, যদি মদীনার লোকেরাও একইভাবে তওবা করত, তাহলে তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হত।

আবু দাউদ বলেছেন: আসবাত বিন নাসর ও সিমাক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। (সুনান আবু দাউদ ৪৩৭৯)

তাহলে, আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইসলামে বিবাহিত ব্যক্তির ধর্ষণের শাস্তি হচ্ছে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যু (রজম)। এই হাদিসে আমরা জানতে পারিনি যে, লোকটি বিবাহিত ছিল না অবিবাহিত ছিল। বিবাহিত, অবিবাহিত উভয়ের ক্ষেত্রেই ধর্ষণের শাস্তি কি পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড? আমরা যদি মাইজ বিন মালিকের রজম সম্পর্কিত হাদিসগুলো পড়ি তাহলে দেখতে পাবো যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ মাইজকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সে বিবাহিত কি না? উত্তরে মাইজ বলেন যে, উনি বিবাহিত। কিন্তু সুনান আবু দাউদ ৪৩৭৯ এর হাদিসে আল্লাহ এর রসূল সাঃ উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন নি যে, ধর্ষক ব্যক্তি বিবাহিত না অবিবাহিত? (ধর্ষণ বিষয়ে অন্য আরও অনেক হাদিস থাকতে পারে) সতর্কতা হিসেবে আমি এতটুকু বলব যে, যদি ধর্ষক ব্যক্তি বিবাহিত হয় তাহলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে - এটা ইসলামের আইন (নুমান বিন বশীর বর্ণিত হাদিসেও তাই আছে; সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬২)। যদি ধর্ষক ব্যক্তি অবিবাহিত হয় তাহলে আইন বা শাস্তি কি হবে? এই বইয়ের শেষ দিকে এই প্রশ্নের উত্তর আছে। আমার মূল বিষয় হচ্ছে বিবাহিত ব্যক্তি যিনাহ করলে তার শাস্তি কি হবে -সেটা নিয়ে আলোচনা করা।

এই প্রশ্নের উত্তর আছে সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬০ হাদিসে। উক্ত হাদিসে, আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) রায় দিয়েছেন যে, যদি ঐ লোকটিকে তার স্ত্রীর দাসী নিজেই স্বেচ্ছায় সঙ্গম করতে দেয় তাহলে, ঐ লোককে ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে যা হচ্ছে সূরা নূরে বর্ণিত বিবাহিত, অবিবাহিত উভয় ধরণের লোকের

জন্য ব্যভিচারের শাস্তি। কিন্তু লোকটিকে যদি তার স্ত্রীর দাসী সঙ্গম করার অনুমতি না দিয়ে থাকে তারপরেও লোকটি যদি ঐ দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে ঐ লোকের শাস্তি হচ্ছে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড। শাস্তির পার্থক্যের কারণ কি? যখন লোকটিকে দাসী সঙ্গম করার অনুমতি দিয়েছে তখন সেটা ছিল যিনাহ আর যখন দাসীর অনুমতি ছাড়া লোকটি তার সাথে সঙ্গম করেছে তখন সেটা ছিল ধর্ষণ কারণ ধর্ষণের মূল বিষয় হচ্ছে কারো অনুমতি ছাড়া তার সাথে সঙ্গম করা। সুনান আবু দাউদের ৪৩৭৯ নাম্বার হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, (কমপক্ষে বিবাহিত ব্যক্তির ব্যাপারে) ধর্ষণের শাস্তি হচ্ছে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড যা আল্লাহ এর রসূল সাঃ ঐ ব্যক্তির জন্য বলবত রেখেছেন যে তার স্ত্রীর (অর্থাৎ অপরের) দাসীর সাথে তার অনুমতি ছাড়া সঙ্গম করে। আর সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর বিবাহিত, অবিবাহিত সকল যিনাহকারীর জন্য শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত। যদি ঐ ব্যক্তি অপরের দাসীর সাথে তার অনুমতি নিয়ে যিনাহ করে তাহলে তা ধর্ষণ হবে না কারণ উভয়ের সম্মতিতে সঙ্গম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটা হবে অবিবাহিত লোকের জন্য যিনাহ আর বিবাহিত লোকের জন্য ব্যভিচার। বিবাহিত, অবিবাহিত উভয়ের জন্য একই শাস্তি - ১০০ বেত্রাঘাত।

সালামা বিন আল মুহাব্বাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"নবী (সাঃ) একজন পুরুষের ব্যাপারে রায় দিলেন যে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সহবাস করেছিল: 'যদি সে (ঐ লোক) তাকে (দাসীকে) জোর করে (সঙ্গম করে থাকে), তাহলে সে (ঐ দাসী) স্বাধীন (আযাদ হয়ে যাবে), এবং তাকে (ঐ লোককে) তার (ঐ দাসীর) মালিককে তার (ঐ দাসীর) পরিবর্তে অনুরূপ দাসী দিতে হবে; যদি সে (ঐ দাসী) তাতে তার (ঐ লোকের সঙ্গমে) আনুগত্য করে (অর্থাৎ সম্মতি দেয়), তাহলে সে (ঐ দাসী) তার (ঐ লোকের) হবে, এবং তাকে (ঐ লোককে) তার (ঐ দাসীর) মালিককে তার (ঐ দাসীর) পরিবর্তে অনুরূপ দাসী দিতে হবে।" (সুনান আন-নাসাঈ বই ২৬, হাদিস ১৬৮; দারুস সালামের মতে হাসান হাদিস)

কিন্তু আমরা তো নুমান বিন বশীর রাঃ থেকে বর্ণিত হাদিসে পড়েছি যে, লোকটি অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে সঙ্গম করে থাকলে ১০০ বেত্রাঘাত আর অনুমতি না পাওয়া সত্ত্বেও দাসীর সাথে সঙ্গম করে থাকলে পাথর নিক্ষেপে হত্যা।

উভয় হাদিস-ই দারুস সালামের মতে হাসান হাদিস। তাহলে, আইন দু'রকম হচ্ছে কেন? এর কারণ হচ্ছে সুনান আন-নাসাঈ বই ২৬, হাদিস ১৬৮ এর হাদিসটি সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার আগের আইন। এই ক্ষেত্রে শুধু সম্পদের (দাসীর) হাত বদল হচ্ছে এবং ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের অধিকার রক্ষা করা হচ্ছে কিন্তু যিনাহের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। স্ত্রীর দাসীকে অন্যের দাসীর মত

মনে করা হচ্ছে না কারণ মাইজকে রজম করা হয়েছিল অন্য বংশের দাসীর সাথে যিনাহ করার কারণে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে (সুনান আন-নাসাঈ বই ২৬, হাদিস ১৬৮) নিজের স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনাহ করার কারণে কোন রকম বেত্রাঘাত বা রজম করা হয়নি। অর্থাৎ অন্যের দাসীর সাথে যিনাহ করাকে হাদ্দের শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু নিজের স্ত্রীর দাসীর সাথে যিনাহ করাকে যিনাহ হিসেবে দেখা হচ্ছে না এবং হাদ্দের শাস্তি প্রযোজ্য হচ্ছে না শুধু মানুষের হক আদায় করা হচ্ছে।
অপরদিকে নুমান বিন বশীর বর্ণিত (সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬০) হাদিসে হাদ্দের শাস্তি প্রযোজ্য হচ্ছে। এখানে বান্দার হক নয় বরং আল্লাহ এর হক আদায় করা হচ্ছে। অর্থাৎ নুমান বিন বশীরের বর্ণিত হাদিসটি হচ্ছে সূরা নুর নাযিলের পরের হাদিস। সূরা নূরে আল্লাহ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, যিনাহকারীর শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত। এখানে বিবাহিত, অবিবাহিতদের জন্য যে আলাদা আইন নেই তা নুমান বিন বশীর বর্ণিত (সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬০) হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন আসবে যে, সূরা নুর নাযিলের আগে শাস্তি ছিল দাসীর মত দাসী --- দাসীর মালিককে বুঝিয়ে দেয়া। কিন্তু সূরা নূরে এমন কিছু কি বলা আছে যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, স্ত্রীর দাসীও অন্য মানুষের দাসীর মতই অধিকার প্রাপ্ত হয়ে গেছে। যে দাসীর সাথে সঙ্গম করার কারণে মাইজ বিন মালিককে রাঃ রজম করা হয়েছিল।

"তোমাদের মধ্যে যারা ''আইয়িম'' (বিপত্নীক পুরুষ বা বিধবা মহিলা) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহতো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা নূরঃ ৩২) আর যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায় তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দাও। **তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা দুনিয়ার জীবনের সম্পদের কামনায় তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তি (ব্যভিচারে) বাধ্য করো না। আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয় তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।**(৩৩) (সূরা নূরঃ ৩২,৩৩)

সূরা নূরের ৩২-৩৩ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার পর কেন দাসীদের সাথে যিনাহ করার শাস্তিতে পরিবর্তন হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। দাস – দাসীদের মধ্যে আল্লাহ বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলেছেন – অর্থাৎ এখন তাদের সম্মানকে সংরক্ষিত করা হয়েছে। তাদের চাহিদা পূরণের একটি সম্মানজনক পন্থা আল্লাহ বলে দিয়েছেন, এখন একজন দাসী অন্যের স্ত্রী হবার যোগ্যতা রাখে। আপনার স্ত্রীর দাসী এখন অন্য লোকের (দাসের) স্ত্রী বা অন্য লোকের (দাসের) স্ত্রী হবে। সে এখন এই ব্যাপারে একজন মুক্ত নারীর প্রায় সমান অধিকার পেয়েছে। তাই, তার সাথে সঙ্গম করলে তা এখন একজন মুক্ত,স্বাধীন নারীর সাথে সঙ্গম করার সমান বলে ধরা হবে অথবা এখন আপনার স্ত্রীর দাসী এখন আপনার কাছে অন্য লোকের দাসীর মত। আল্লাহ দাসীদের বেশ্যাবৃত্তিতে বা ব্যভিচারে বাধ্য করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এখন অন্য লোকের দাসীর সাথে আপনি যেমনি সঙ্গম করার অধিকার রাখেন না বা সঙ্গম করলে হাদ্দের আইন আপনার উপর কার্যকর করা হবে তেমনি আপনার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করলে একই শাস্তি হবে। যদি কেউ দাসীদের বেশ্যাবৃত্তিতে বা ব্যভিচারে বাধ্য করে তাহলে এতে দাসীদের কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু যে দাসীর সাথে ব্যভিচার করবে তার উপর হাদ্দের আইন কার্যকর হবে। সুতরাং আপনার স্ত্রীর দাসীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে আপনার উপর হাদ্দের আইন কার্যকর হবে। যদি আপনার স্ত্রীর দাসীটি আপনাকে অনুমতি দিয়ে থাকে তাহলে আপনি কোরআনের আইন এবং নবীর নির্দেশ মোতাবেক ১০০ বেত্রাঘাত পাবেন আর যদি আপনার স্ত্রীর দাসীটি আপনাকে অনুমতি না দেয় তাহলে তার সাথে সঙ্গম করা হবে তাকে ধর্ষণ করা ফলে ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে স্বামীকে (উক্ত ব্যক্তিকে) রজম করা হবে।

অর্থাৎ সূরা নূরের ৩২,৩৩ নাম্বার আয়াত নাযিল হবার পর একজন দাসী প্রায় একজন মুক্ত নারীর মত অধিকার পাবে। সে বিয়ে করতে পারবে, তাকে ব্যভিচারে বাধ্য করা যাবে না। এজন্য সূরা নুর নাযিল করার আগে স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করলে যা শাস্তি হত তা পাল্টে গিয়ে নতুন আইন কার্যকর হয়েছে আর তা হচ্ছে একজন মুক্ত নারীর সাথে সঙ্গমের ব্যাপারে হাদ্দের যে আইন, স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করলে একই আইন আর তা হচ্ছে সূরা নূরে উল্লেখিত ১০০ বেত্রাঘাত। এক্ষেত্রে দাসী যদি অনুমতি না দিয়ে থাকে তাহলে এটা ধর্ষণ বলে গণ্য হবে এবং এজন্য স্বামীকে ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে রজম করা হবে।

এখন প্রশ্ন আসবে যে সূরা নুর নাযিলের পর স্ত্রী কি তার স্বামীকে স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করার অনুমতি দিতে পারবে? সূরা নুর নাযিলের পর একজন দাসীর সাথে তার মালিক (Owner) ব্যতীত অন্য কেউ

দাসীর অনুমতি ছাড়া সঙ্গম করলে তা ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হবে; আল্লাহ সূরা নূরে দাসীদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে বা ব্যভিচারে বাধ্য না করতে হুকুম দিয়ে দিয়েছেন সুতরাং এখন স্ত্রীরও অধিকার নেই যে সে তার দাসীকে তার (স্ত্রীর) স্বামীর সাথে সঙ্গম করতে অনুমতি দিতে পারে বা বাধ্য করতে পারে।
স্ত্রীর দাসীদের সাথে যিনাহ বা ব্যভিচারের বিষয়ে আইন পরিবর্তনে সূরা নিসার কিছু আয়াতও প্রভাব রেখেছে বলে প্রতীয়মান হয়।
"আর তোমরা বিবাহ করো না নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ। তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে (তা ক্ষমা করা হল)। নিশ্চয় তা হল অশ্লীলতা ও ঘৃণিত বিষয় এবং নিকৃষ্ট পথ। (২২) তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে, তোমাদের মেয়েদেরকে, তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, ভাতিজীদেরকে, ভাগ্নীদেরকে, তোমাদের সে সব মাতাকে যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোনদেরকে, তোমাদের শ্বাশুড়ীদেরকে, তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছ সেসব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যেসব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদেরকে, আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলিত না হয়ে থাক তবে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং দুই বোনকে একত্র করা(তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে)। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৩) নারীদের মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ নারীগণও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, **কিন্তু তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের বাদে, আল্লাহ এসব ব্যবস্থা তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন।** তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ নারীদের ছাড়া অন্যান্য সকল নারীদেরকে মোহরের অর্থের বদলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, **অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়**। অতঃপর তাদের মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করেছ, তাদেরকে তাদের ধার্যকৃত মোহর প্রদান কর। তোমাদের প্রতি কোনও গুনাহ নেই মোহর ধার্যের পরও তোমরা উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে মোহরের পরিমাণে হেরফের করলে, নিশ্চয় আল্লাহ সবিশেষ পরিজ্ঞাত ও পরম কুশলী। (২৪) (সূরা নিসা ২২-২৪)
সূরা নূরের ২২-২৪ নাম্বার আয়াত থেকে বুঝা যায় যে কারা কারা একজন মুসলিম পুরুষের বিবাহের জন্য বৈধ এবং কারা কারা বিয়ের জন্য বৈধ নয়। একজন মুসলিম পুরুষ চাইলে তার অধিকারভুক্ত দাসীকে মহরের বিনিময়ে বিয়ে করতে পারবে। আপনার স্ত্রীর দাসী আপনার দাসী নয় তাকে আপনার জন্য বৈধ করা হয়নি - এই কথা উপরের আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার। সূরা নিসার উপরোক্ত আয়াতগুলো এবং সূরা নূর নাযিলের পর কেউ যদি তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে তা অবৈধ

সম্পর্ক বলে গণ্য হবে আর এজন্য তার উপর হাদ্দের আইন কার্যকর হবে যা আল্লাহ এর রসূল সাঃ আমাদেরকে বলেছেন। স্ত্রীর দাসীদের সাথে সঙ্গমের শাস্তির হাদিসগুলো থেকেও বুঝা যায় যে, যিনাহ ব্যভিচারের আইনগুলো কোরআনের বিভিন্ন আয়াত নাযিলের ফলে পরিবর্তন হচ্ছিল। মাইজ বিন মালিককে রজম করা হয়েছিল তার অধিকারভুক্ত নয় এমন একজন দাসীর সাথে সঙ্গম করার কারণে; সূরা নিসার আয়াতগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, একজনের স্ত্রীর দাসী তার দাসী নয় এবং একজন ব্যক্তি তার নিজের দাসী ছাড়া এবং বিয়ে ছাড়া অন্য কারো সাথে সঙ্গম করলে তা অবৈধ যৌন সম্পর্ক বলে গণ্য হবে। এ জন্য তার উপর হাদ্দের আইন কার্যকর হবে। নুমান বিন বশীরের হাদিস থেকে জানা গেল যে, এখন থেকে স্ত্রীর দাসীর সাথে যদি কেউ সঙ্গম করে তাহলে তাকে ১০০ বেত্রাঘাত দেয়া হবে যদিও তাকে রজম করার কথা ছিল কারণ মাইজ বিন মালিককে তার অধিকারভুক্ত নয় এমন একজন দাসীর সাথে সঙ্গম করার কারণে রজম করা হয়েছিল কিন্তু এখন অধিকারভুক্ত নয় এমন একজন দাসীর সাথে সঙ্গম করার কারণে রজম করার নির্দেশ দেয়া হয়নি - দেয়া হয়েছে ১০০ বেত্রাঘাতের আদেশ যা সূরা নূরে বর্ণিত ব্যভিচারীর শাস্তি। আদেশটি দিয়েছেন মুহাম্মাদ সাঃ । তাহলে, এখন থেকে বিবাহিত, অবিবাহিত সকল অবৈধ যিনাহকারীর জন্য ফরয এবং সুন্নত শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত। রজম করা বা পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি ইসলামে আর থাকল না। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ এর জন্য যিনি মুহাম্মাদ সাঃ এর উম্মতের জন্য কঠিন শাস্তির আইন বাতিল করে সহজ শাস্তির বিধান দিলেন। বর্তমানে, বিবাহিত এবং অবিবাহিত সকল যিনাহকারী এবং ব্যভিচারীর জন্য শাস্তি হচ্ছে শুধুমাত্র ১০০ বেত্রাঘাত – এই সকল ক্ষেত্রে রজম করা হারাম হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, সূরা নূর নাযিল করার পর শুধু মুক্ত, স্বাধীন নারী নয় বরং স্ত্রীর দাসীর সাথে সঙ্গম করার আইনও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এখন স্ত্রীর দাসী প্রায় একজন মুক্ত / স্বাধীন নারীর মতই অধিকার পাবে। স্বাধীন নারীর সাথে তার অনুমতিক্রমে সঙ্গম করলে যেমনি ১০০ বেত্রাঘাত শাস্তি হিসেবে পেতে হবে তেমনি স্ত্রীর দাসীর সাথে তার অনুমতিক্রমে সঙ্গম করলে শাস্তি হিসেবে ১০০ বেত্রাঘাত পেতে হবে। আবার স্বাধীন নারীর সাথে তার অনুমতি ছাড়া (জোরপূর্বক) সঙ্গম করলে যেমনি শাস্তি হিসেবে রজম পেতে হবে তেমনি স্ত্রীর দাসীর সাথে তার অনুমতি ছাড়া সঙ্গম করলে শাস্তি হিসেবে রজম পেতে হবে। অর্থাৎ সূরা নূর নাযিল হবার পর পূর্ববর্তী আইনগুলো বাতিল হয়ে সূরা নূরের আইনটি সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। অনুমতি ছাড়া বা ধর্ষণের বিষয়টি আলাদা কারণ এখানে একজনের উপর অপর জন যৌন নির্যাতন করছে, সম্মান হানি করছে।

যেহেতু দাসীরা একজন স্বাধীন নারীর মত পূর্ণ অধিকার পায় না, হয়তো, এজন্য দাসীদের যিনাহের ব্যাপারে একটি আলাদা আইন আছে।

আবু হুরায়রা এবং যায়েদ বিন খালিদ থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যদি কোন দাসী (আমা) অবৈধ যৌনসঙ্গম করে, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করো; যদি সে আবার তা করে, তাহলে তাকে আবার বেত্রাঘাত করো; যদি সে আবার তা করে, তাহলে তাকে আবার বেত্রাঘাত করো।" বর্ণনাকারী আরও বলেন যে, তৃতীয়বার বা চতুর্থবার অপরাধের ক্ষেত্রে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "একটি চুলের রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিও।" (সহীহ আল-বুখারী ২৫৫৫, ২৫৫৬)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, সূরা নিসা এবং সূরা নূর নাযিলের পর বিবাহিত, অবিবাহিত সকল যিনাহকারীর জন্য শাস্তি একটিই আর তা হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত। সূরা নূর ও সূরা নিসা নাযিলের পর ইসলামে আর রজমের বিধান থাকল না। সুন্নত হিসেবেও কেউ আর রজম করতে পারবে না বা রজমের নির্দেশ দিতে পারবে না।

"সেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের নিজেদের মধ্য হতেই একজন সাক্ষী তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাব, এবং তোমাকে (মুহাম্মাদ) এদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসব। আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, সত্য পথের নির্দেশ, রহমত আর আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ"। (সূরা নাহল ৮৯)

আল্লাহ বলেছেন, কোরআন সকল বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার করবে এবং ব্যাখ্যা করবে। সুতরাং কোরআন থেকেই আমরা আবার বুঝতে চেষ্টা করবো যে, বিবাহিত এবং অবিবাহিত যিনাহকারীর শাস্তি কি হবে?

এখন আমরা সূরা নূরের ১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত বুঝে বুঝে পড়বঃ

সূরা নূরের ১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াতঃ

"এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।(১) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত (বেত্রাঘাত) করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২) ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা

মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে। (৩) যারা সতী সাধ্বী নারীর উপর অপবাদ দেয়, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর, আর তাদের সাক্ষ্য কক্ষনো গ্রহণ কর না, এরাই না-ফরমান। (৪) অবশ্য এরপর যদি তারা তাওবাহ করে ও সংশোধিত হয়, কেননা আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (৫) আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের উপর অপবাদ দেয়, কিন্তু নিজেদের ছাড়া তাদের অন্য কোন সাক্ষী না থাকে, এ রকম প্রত্যেক লোকের সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। (৬) আর পঞ্চমবারে বলবে যে, সে যদি মিথ্যেবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত পতিত হবে। (৭) আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ ক'রে বলে যে, সে (তার স্বামী) অবশ্যই মিথ্যেবাদী। (৮) এবং পঞ্চমবারে বলে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে। (৯) তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে), আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, বড়ই হিকমতওয়ালা। (১০) যারা এ অপবাদ উত্থাপন করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল, এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কর না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে প্রতিফল যতটুকু পাপ সে করেছে। আর এ ব্যাপারে যে নেতৃত্ব দিয়েছে তার জন্য আছে মহা শাস্তি। (১১) তোমরা যখন এটা শুনতে পেলে তখন কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীরা তাদের নিজেদের লোক সম্পর্কে ভাল ধারণা করল না আর বলল না, 'এটা তো খোলাখুলি অপবাদ।' (১২) তারা চারজন সাক্ষী হাযির করল না কেন? যেহেতু তারা সাক্ষী হাযির করেনি সেহেতু আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যেবাদী। (১৩) দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের উপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যাতে তড়িঘড়ি লিপ্ত হয়ে পড়েছিলে তার জন্য মহা শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করত। (১৪) যখন এটা তোমরা মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে আর তোমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা এটাকে নগণ্য ব্যাপার মনে করেছিলে, কিন্তু আল্লাহর নিকট তা ছিল গুরুতর ব্যাপার। (১৫) তোমরা যখন এটা শুনলে তখন তোমরা কেন বললে না যে, এ ব্যাপারে আমাদের কথা বলা ঠিক নয়। আল্লাহ পবিত্র ও মহান, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ! (১৬) আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা আর কখনো এর (অর্থাৎ এ আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো না যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। (১৭) আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে আয়াত বর্ণনা করছেন, কারণ তিনি হলেন সর্ববিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী, বড়ই হিকমতওয়ালা। (১৮) যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তদ শাস্তি এবং আল্লাহ

জানেন, তোমরা জাননা। (১৯) তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পেতেনা, এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। (২০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়ত্বানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেউ শয়ত্বানের পদাংক অনুসরণ করলে সে তাকে নির্লজ্জতা ও অপকর্মের আদেশ দেবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের একজনও কক্ষনো পবিত্রতা লাভ করতে পারত না। অবশ্য যাকে ইচ্ছে আল্লাহ পবিত্র করে থাকেন, আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সর্ববিষয়ে অবগত। (২১) (সূরা নূরঃ১-২১)

সূরা নূরের ১১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত আয়াতে আল্লাহ মা আয়েশার রাঃ পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। এমন কি ঘটনা ঘটেছিল যে আল্লাহকে কোরআনে মা আয়েশার রাঃ পবিত্রতা ঘোষণা করতে হল? আমরা আগে ঘটনাটা হাদিস থেকে জেনে নেই।

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী ‘আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ ‘উরওয়াহ ইবনু যুবায়র, সা’ঈদ ইবনু মুসায়্যিব, ‘আলক্বামাহ ইবনু ওয়াক্কাস ও ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উত্বাহ ইবনু মাস’ঊদ (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণী ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, যখন অপবাদ রটনাকারীগণ তাঁর প্রতি অপবাদ রটিয়েছিল। রাবী যুহরী (রহ.) বলেন, তারা প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশবিশেষ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও সঠিকভাবে বর্ণনা করার ব্যাপারে তাদের কেউ কেউ একে অন্যের চেয়ে অধিকতর অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য। ‘আয়িশাহ (রাঃ) সম্পর্কে তারা আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন আমি তাদের প্রত্যেকের কথাই ঠিকঠাকভাবে স্মরণ রেখেছি। তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশ অপরের বর্ণিত হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করে। যদিও তাদের একজন অন্যের চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী। বর্ণনাকারীগণ বলেন, ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সফরে যেতে ইচ্ছে করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের (নির্বাচনের জন্য) কোরা ব্যবহার করতেন। এতে যার নাম উঠত তাকেই তিনি সঙ্গে নিয়ে সফরে যেতেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এমনি এক যুদ্ধে তিনি আমাদের মাঝে কোরা ব্যবহার করেন, এতে আমার নাম উঠে আসে। তাই আমিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সফরে গেলাম। এ ঘটনাটি পর্দার হুকুম নাযিলের পর ঘটেছিল। তখন আমাকে হাওদাসহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হত। এমনিভাবে আমরা চলতে থাকলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এ যুদ্ধ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন তিনি (গৃহাভিমুখে) প্রত্যাবর্তন করলেন। ফেরার পথে আমরা মদিনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য আদেশ করলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেয়া হলে আমি উঠলাম এবং

(প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য) পায়ে হেঁটে সেনাছাউনী পেরিয়ে (সামনে) গেলাম। অতঃপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দ্বারা তৈরি করা আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথায় পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি খোঁজ করতে লাগলাম। হার খুঁজতে খুঁজতে আমার আসতে দেরী হয়ে যায়। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদা উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আমি আরোহণ করতাম। তারা ভেবেছিলেন, আমি ওর মধ্যেই আছি, কারণ খাদ্যাভাবে মহিলারা তখন খুবই হালকা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ গোশতবহুল ছিল না। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদা উঠিয়ে উপরে রাখেন তখন তারা হালকা হাওদাটিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজ জায়গায় ফিরে এসে দেখি তাঁদের (সৈন্যদের) কোন আহবানকারী এবং কোন জওয়াব দাতা সেখানে নেই। তখন আমি আগে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেয়ে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে ধরলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বানূ সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনু মুআত্তাল (রাঃ) [যাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য পশ্চাতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন] সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি সকালে আমার অবস্থানস্থলের কাছে এসে একজন ঘুমন্ত মানুষ দেখে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে চিনে ফেললেন। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাযিউন' পড়লে আমি তা শুনে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! আমি কোন কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্না লিল্লাহ........ পাঠ ব্যতীত অন্য কোন কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিলে আমি গিয়ে তাতে উঠে পড়লাম। পরে তিনি আমাকে সহ সওয়ারীকে টেনে আগে আগে চললেন, অতঃপর ঠিক দুপুরে প্রচন্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করছিলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা (আমার উপর অপবাদ দিয়ে) ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এ অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল সে হচ্ছে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূল। বর্ণনাকারী 'উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তার

(‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলূল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার করা হত এবং আলোচনা করা হত আর অমনি সে এগুলোকে বিশ্বাস করত, খুব ভাল করে শুনত আর শোনা কথার ভিত্তিতেই ব্যাপারটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করত। ‘উরওয়াহ (রাঃ) আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাস্সান ইবনু সাবিত, মিসতাহ ইবনু উসাসা এবং হামনা বিনত জাহাশ (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা কয়েকজন লোকের একটি দল ছিল, এটুকু ব্যতীত তাদের ব্যাপারে আমার আর কিছু জানা নেই। যেমন (আল-কুরআনে) মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন। এ ব্যাপারে যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সুলূল বলে ডাকা হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী ‘উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, ‘আয়িশাহ (রাঃ) এ ব্যাপারে হাস্সান ইবনু সাবিত (রাঃ)-কে গালমন্দ করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, হাস্সান ইবনু সাবিত (রাঃ) তো সেই লোক যিনি তার এক কবিতায় বলেছেন, আমার মান সম্মান এবং আমার বাপ দাদা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা মাদ্বীনায় আসলাম। মদিনায় এসে এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে লোকেদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে থাকল। কিন্তু এগুলোর কিছুই আমি জানি না। তবে আমি সন্দেহ করছিলাম এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর আগে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যে রকম স্নেহ-ভালবাসা পেতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল ‘‘তুমি কেমন আছ’’ জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে ভীষণ সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার আগে পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদের ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। উম্মু মিসতাহ (রাঃ) (মিসতাহর মা) একদা আমার সঙ্গে পায়খানার দিকে বের হন। আর প্রকৃতির ডাকে আমাদের বের হওয়ার অবস্থা এই ছিল যে, এক রাতে বের হলে আমরা আবার পরের রাতে বের হতাম। এটা ছিল আমাদের ঘরের পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করার আগের ঘটনা। আমাদের অবস্থা প্রাচীন আরবের লোকদের অবস্থার মতো ছিল। তাদের মতো আমরাও পায়খানা করার জন্য ঝোপঝাড়ে চলে যেতাম। এমনকি (অভ্যাস না থাকায়) বাড়ির পার্শ্বে পায়খানা তৈরি করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমি এবং উম্মু মিসতাহ ‘‘যিনি ছিলেন আবূ রূহম ইবনু মুত্তালিব ইবনু ‘আবদে মুনাফির কন্যা, যার মা সাখার ইবনু ‘আমির-এর কন্যা ও আবূ বাকর সিদ্দীকের খালা এবং মিসতাহ ইবনু উসাসা ইবনু আববাদ ইবনু মুত্তালিব যার পুত্র’’ একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে নিস্ক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে উম্মু মিসতাহ তার কাপড়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে

পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বদর যুদ্ধে যোগদানকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন? তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্বন্ধে কী কথা বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সে আমার সম্পর্কে কী বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরো বেড়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ? 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কী আলোচনা করছে? তিনি বললেন, বেটী এ ব্যাপারটিকে হালকা করে ফেল। আল্লাহর কসম! সতীন আছে এমন স্বামীর সোহাগ লাভে ধন্যা সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে। 'আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, সারারাত আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার চোখের পানিও বন্ধ হল না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম। তিনি আরো বলেন যে, এ সময় ওয়াহী নাযিল হতে দেরি হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে 'আলী ইবনু আবূ তালিব এবং উসামাহ ইবনু যায়দ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি ['আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, উসামাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি ভালবাসার কারণে বললেন, তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আর আলী (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি ব্যতীত আরো বহু মহিলা আছে। অবশ্য আপনি এ ব্যাপারে দাসী [বারীরাহ (রাঃ)]-কে জিজ্ঞেস করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বারীরাহ (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, হে বারীরাহ! তুমি তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহপূর্ণ আচরণ দেখেছ কি? বারীরাহ (রাঃ) তাঁকে বললেন, সে আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাঁকে দোষী বলা যায়।

তবে তাঁর সম্পর্কে কেবল এটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা কিশোরী, রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বাকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে। তিনি ['আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে মিম্বরে বসে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহবান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আর তাঁরা এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার ব্যাপারেও আমি ভাল ব্যতীত কিছু জানি না। সে তো আমার সঙ্গেই আমার ঘরে যায়। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, বানী 'আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ (ইবনু মুআয) (রাঃ) উঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেব। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তাহলে তার শিরচ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই করব। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এ সময় হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রাঃ)-এর মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'ঈদ ইবনু উবাদা (রাঃ) দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেনঃ এ ঘটনার আগে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। গোত্রীয় অহঙ্কারে উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবনু মুআয (রাঃ)-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। সে তোমার গোত্রের লোক হলে তুমি তার নিহত হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সা'দ ইবনু মুআয (রাঃ)-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাঃ) সা'দ ইবনু 'উবাইদাহ (রাঃ)-কে বললেন, বরং তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলছ। তিনি ['আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে যায়। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প করে বসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের শান্ত করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। চোখের ধারা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও হয়নি। তিনি বলেন, আমি কান্না করছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। এমনি করে একদিন দুই রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমার একটুও ঘুম হয়নি। বরং অনবরত আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার কারণে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আববা-আম্মা আমার পার্শ্বে

উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সঙ্গে কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি বলেন, আমরা কান্না করছিলাম এই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার পার্শ্বে এসে এভাবে তিনি আর বসেননি। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একমাস অপেক্ষা করার পরও আমার ব্যাপারে তাঁর নিকট কোন ওয়াহী আসেনি। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, বসার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন, 'আয়িশাহ তোমার ব্যাপারে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে পবিত্র হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ করে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তওবা কবূল করেন। তিনি ['আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কথা শেষ করলে আমার অশ্রুধারা বন্ধ হয়ে যায়। এক ফোঁটা অশ্রুও আমি আর টের করতে পারলাম না। তখন আমি আমার আববাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলছেন আমার হয়ে তার জবাব দিন। আমার আববা বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কী জবাব দিব তা জানি না। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলছেন, আপনি তার উত্তর দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কী উত্তর দিব তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশী পড়তে পারতাম না। **তথাপিও এ অবস্থা দেখে আমি (আয়েশা রাঃ) নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের গল্প শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন।** আল্লাহর কসম! আমি ও আপনারা যে বিপাকে পড়েছি এর জন্য ইউসুফ (আঃ)-এর পিতার কথা ব্যতীত আমি কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেনঃ ''কাজেই পূর্ণ ধৈর্য্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ এ ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল।'' অতঃপর আমি মুখ ঘুরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন তবে

আল্লাহর কসম, আমি কক্ষণো ভাবিনি যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াহী অবতীর্ণ করবেন যা পাঠ করা হবে। আমার সম্পর্কে আল্লাহ কোন কথা বলবেন আমি নিজেকে এতটা উত্তম মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অনেক অধম বলে ভাবতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে স্বপ্নযোগে দেখানো হবে যার ফলে আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করবেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখনো তাঁর বসার জায়গা ছেড়ে যাননি এবং ঘরের লোকজনও কেউ ঘর হতে বেরিয়ে যাননি। এমন সময় তাঁর উপর ওয়াহী অবতরণ শুরু হল। ওয়াহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ ধরনের কষ্ট হত তখনও সে অবস্থা হল। এমনকি ভীষণ শীতের দিনেও তাঁর শরীর হতে মোতির দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ল ঐ বাণীর গুরুভারে, যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি হাসিমুখে পহেলা যে কথা উচ্চারণ করলেন সেটা হল, হে 'আয়িশাহ! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি ['আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, এ কথা শুনে আমার মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সম্মান কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর দিকে উঠে যাব না। মহান আল্লাহ ব্যতীত কারো প্রশংসা করব না। 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ (আমার পবিত্রতার ব্যাপারে) যে দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, তা হ'ল, ''যারা এ অপবাদ রটনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এ ঘটনাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাচারী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং একে তোমরা তুচ্ছ ব্যাপারে বলে ভাবছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল খুবই গুরুতর ব্যাপার। এবং এ কথা শোনামাত্র তোমরা কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের জন্য উচিত নয়। আল্লাহ পবিত্র মহান! এ তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে না; আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার

কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেত না। আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু- (সূরাহ আন-নূর ২৪/১১-২০)। আমার পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করলেন। আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) মিসতাহ ইবনু উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু ‘আয়িশাহ (রাঃ) সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করলেন-তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। শোন! তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল; পরম দয়ালু- (সূরাহ আন-নূর ২৪/২২)। আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ (রাঃ)-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনঃ দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে এ অর্থ দেয়া আর কখনো বন্ধ করব না। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, আমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়নাব বিনত জাহাশ (রাঃ)-কেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যায়নাব (রাঃ)-কে বলেছিলেন, তুমি ‘আয়িশাহ (রাঃ) সম্পর্কে কী জান অথবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার চোখ ও কানকে হিফাযত করেছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে ভাল ব্যতীত আর কিছুই জানি না। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বনদ্বী ছিলেন। আল্লাহ তাঁর তাকওয়ার কারণে তাঁকে রক্ষা করেছেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা (রাঃ) তাঁর পক্ষ নিয়ে অপবাদ রটনাকারীদের মতো অপবাদ ছড়াচ্ছিল। ফলে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্তদের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেলেন। বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব (রহ.) বলেন, ঐ সমস্ত লোকের ঘটনা আমার কাছে যা পৌঁছেছে তা হলো এইঃ ‘উরওয়াহ (রহ.) বলেন, ‘আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ মহান, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি কোন রমণীর বস্ত্র অনাবৃত করে কোনদিন দেখিনি। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, পরে তিনি আল্লাহর পথে শহীদ হন। (সাহিহ বুখারি ৪১৪১; অনুরূপ হাদিস সাহিহ বুখারি ৪৭৫০)

ইবনে আশুর (Ibn 'Ashoor) তার বিখ্যাত বই "আত-তাহরীর ওয়াত তানভীর"(al-Tahrir wa al-Tanweer) এ উল্লেখ করেছেন যে, সূরা নুরের প্রথম তিনটি আয়াত তৃতীয় হিজরির আগেই নাযিল হয়েছিল এবং তা প্রথম হিজরির শেষ দিকে বা দ্বিতীয় হিজরির শুরুর দিকেও নাযিল হয়ে থাকতে পারে। এই তিনটি আয়াত-ই সূরা নূরের নাযিল হওয়া প্রথম আয়াত। তারপর চতুর্থ হিজরীতে সূরা নূরের ১১-২১তম আয়াত নাযিল হয় যাতে মা আয়েশার পবিত্রতা এবং নির্দোষসিতার ব্যাপারে বলা হয়েছে। সূরা নূরের ৪-৫ নাম্বার আয়াতও কিছু আলেমের মতে মা আয়েশার ইফকের ঘটনার পরে নাযিল হয়েছে। ইবনে আশুর মতে, সূরা নূরের ৬-১০ নাম্বার আয়াত ৯ম হিজরীতে নাযিল হয়েছে।

সূরা নূরের ২য় আয়াত অধিকাংশ আলেমের মতে, শুধুমাত্র অবিবাহিতদের জন্য শাস্তির বিধান হিসেবে নাযিল হয়েছে অথচ সূরা নূরের ১ নাম্বার আয়াত এবং ৩ থেকে ২১ নাম্বার আয়াতে বিবাহিত ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ শুধু অবিবাহিতদের জন্য আইন দিয়েছেন - এটা কিভাবে সম্ভব? আল্লাহ সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে বলেন নি যে, এই শাস্তি শুধুমাত্র অবিবাহিতদের জন্য। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, সূরার নূরের ১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াত বিবাহিত এবং অবিবাহিত সবার জন্য প্রযোজ্য হবে।

সূরা নূরের প্রথম ৩ টি আয়াত সবার প্রথমে নাযিল করা হয়েছে যেখানে সূরা নূরের প্রথম আয়াত ব্যাখ্যা করেই আমরা বুঝতে পেরেছি যে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ যে আইন দিবেন তা বিবাহিত অবিবাহিত সবার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং অবৈধ যিনাহ সম্পর্কিত আগের সকল আইন বাতিল হয়ে যাবে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ সূরা নূরের ৩ টি আয়াত নাযিলের পর মা আয়েশার রাঃ ইফকের ঘটনা নিয়ে আয়াত নাযিল করে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কেন তিনি রজমের আইনকে বাতিল করে শুধু বেত্রাঘাতের আইন দিয়েছেন। চিন্তা করে দেখুন, ইফকের ঘটনায় আল্লাহ যদি হস্তক্ষেপ না করতেন তাহলে কি অবস্থা হতে পারত? কি হতে পারত তা আমরা মা আয়েশার কথা থেকে বুঝতে পারি যা তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ) কে বলেছিলেন, “আমি (আয়েশা) বললাম, “আল্লাহর কসম, আমি জানি যে আপনারা এই (ইফকের) গল্পটি এতটাই শুনেছেন যে তা আপনাদের মনে গেঁথে গেছে এবং আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন। এখন, যদি আমি আপনাদেরকে বলি যে আমি নির্দোষ, আর আল্লাহ জানেন যে আমি নির্দোষ, আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না; আর যদি আমি কিছু স্বীকার করি, আর আল্লাহ জানেন যে আমি তা থেকে নির্দোষ, তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন"। একজন নারীর উপর বা স্ত্রীর উপর কি পরিমাণ চাপ পড়েছে চিন্তা করে দেখুন, তিনি বলছেন যে, আমি যদি বলি আমি নির্দোষ তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না কিন্তু আমি যদি স্বীকার করে নেই

তাহলে আপনারা বিশ্বাস করবেন। এত চাপ পড়ার কারণ হচ্ছে এই ঘটনা নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ লেগে যাবার মত অবস্থা তৈরি হয়েছিল। এই অবস্থায় এত চাপে পড়ে একটি অল্প বয়স্ক মেয়ে অপরাধ না করেও নিজেকে ব্যভিচারী বলে স্বীকার করে নিতে পারে শুধু নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। কারণ সে চিন্তা করতে পারে যে, আমার একজনের জীবনের বিনিময়ে যদি যুদ্ধ বন্ধ হয়, অনেক মুসলিমের জীবন বাঁচে তাহলে আমার জীবন কোরবানি করে দেয়াই উত্তম। আল্লাহ এর রহমত যে, আয়েশা রাঃ মুহাম্মাদ (সাঃ) কে হাদিসে উল্লেখিত কথা বলার পরপরই আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাযিল করে মা আয়েশাকে নির্দোষ ঘোষণা করেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন চলে আসে যে, কোরআন নাযিল এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে,নবী সাঃ আমাদের মাঝে থাকবেন না। তখন কপট, দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা হাজারো নারীর বিরুদ্ধে এই রুপ অভিযোগ নিয়ে আসবে। যেখানে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ)-ই নিজের স্ত্রীকে নির্দোষ প্রমান করতে পারেন নি সেখানে সাধারণ লোক কি করতে পারবে - এই রুপ মুনাফিকদের বিরুদ্ধে? এজন্যই আল্লাহ রজমের আইন বাতিল করে দিয়েছেন কারণ এতে বহু নিরপরাধ নারী ও পুরুষের জীবন রজমের মাধ্যমে শেষ হবার আশংকা রয়েছে। যারা নিজেদের মায়ের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনতে পারে তারা অন্য নারীদের ব্যাপারে কি করবে? যারা নবীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ করতে পারে তারা অন্য নারীদের ব্যাপারে কি করবে? আল্লাহ যে রজমের আইনকে বাতিল করে শুধুমাত্র বেত্রঘাতের শাস্তি বিবাহিত এবং অবিবাহিত সকল যিনাহকারীর জন্য প্রযোজ্য করেছেন তার যৌক্তিকতা আল্লাহ সূরা নূরের ১১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াতে তুলে ধরেছেন। একজন বিবাহিত নারীকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার মত ঘটনা যেন না ঘটে তাই আল্লাহ রজমের শাস্তি বাতিল করে দিয়ে শুধু বেত্রাঘাতের শাস্তি আইন হিসেবে দিয়েছেন বলে আমি মনে করি। সূরা নূরের ১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াতগুলো পড়ে আমার তাই মনে হয়েছে।

সূরা নূরের ১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াত মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখতে পাবেন যে, উক্ত আয়াতগুলোতে শাস্তি দিয়ে যিনাহ বন্ধ করার চেয়ে নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায়-ই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নারীর নিরাপত্তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সূরা নূরের ১৯ নাম্বারে আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, "যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।" উক্ত আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে কিভাবে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায়। কোন মেয়ে হিজাব না করলে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায় না বরং কোন নারীকে মিথ্যা অপবাদ দিলে, কোন নারীকে নিয়ে অশ্লীল কথা আলোচনা করলে, কোন নারীকে

অসম্মান করে কথা বললে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায়। আল্লাহ সূরা নূরের ১১-২১ নাম্বার আয়াত নাযিল করেছেন মা আয়েশার ইফকের ঘটনার পরে। এই আয়াতগুলোতে মা আয়েশাকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং মুমিনরা যেন আর কখনো এই রুপ কথা না বলে সেই ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে এই আয়াতগুলোতে।

সূরা নুর নাযিল হবার পর আমরা বুঝতে পারলাম যে, একজন নারীকে নিয়ে সমাজে অশ্লীল আলোচনা যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

আমি নবী (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম, এক ব্যক্তি এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি আইনত শাস্তিযোগ্য পাপ করেছি; দয়া করে আমাকে আইনত শাস্তি দিন।" নবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন না যে সে কী করেছে। তারপর সালাতের সময় হয়ে গেল এবং লোকটি নবী (সাঃ)-এর সাথে সালাত আদায় করল। নবী (সাঃ) যখন সালাত শেষ করলেন, তখন লোকটি আবার উঠে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি আইনত শাস্তিযোগ্য পাপ করেছি; দয়া করে আল্লাহর আইন অনুসারে আমাকে শাস্তি দিন।" নবী (সাঃ) বললেন, "তুমি কি আমাদের সাথে সালাত আদায় করোনি?" সে বলল, "হ্যাঁ।" নবী (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ তোমার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।" অথবা বললেন, "....তোমার আইনত শাস্তিযোগ্য পাপ।" (সহীহ আল-বুখারী ৬৮২৩)

উপরোক্ত হাদিস (সাহিহ বুখারি ৬৮২৩) মোতাবেক, বর্তমানে কোন পুরুষ বা নারী যদি যিনাহ বা ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিতে আসে তবে তার স্বীকারোক্তি শুনা হবে না। বিচারক বা কাজীর সামনে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষী দেয়ার আগেই তাকে বলা হবে যে, তার অপরাধের জন্য তওবা করতে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিখুতভাবে পড়তে, তাহলেই আল্লাহ তাকে মাপ করে দিবেন। আখিরাতে যিনাহ বা ব্যভিচারের শাস্তি থেকে বাচার জন্য নিজের উপর হাদ্দের শাস্তি নেবার এখন আর কোন প্রয়োজন নেই।

সুতরাং কোরআন হাদিস থেকে সকল আলোচনা শেষে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইসলামে বিবাহিত, অবিবাহিত সকল যিনাহকারীর জন্য শাস্তি হচ্ছে শুধুমাত্র ১০০ বেত্রাঘাত। যিনাহ বা ব্যভিচারের জন্য শাস্তি হিসেবে পাথর নিক্ষেপে হত্যা বা রজম ইসলামে আর নেই। ব্যভিচারের জন্য শাস্তি হিসেবে রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যার আইন বাতিল হয়ে গেছে।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে বসে বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মদ (সাঃ) কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন এবং

তাঁর উপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং তাঁর উপর যা নাজিল হয়েছিল তাতে পাথর ছুঁড়ে মারার আয়াতটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা তা পাঠ করেছি, আমরা মুখস্থ করেছি এবং তা বুঝতে পেরেছি। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বিবাহিত ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার শাস্তি দিয়েছিলেন এবং তাঁর পরে আমরাও পাথর ছুঁড়ে হত্যার শাস্তি দিয়েছিলাম। আমার আশঙ্কা, সময়ের সাথে সাথে লোকেরা (এটা ভুলে যেতে পারে) এবং বলতে পারে: আমরা আল্লাহর কিতাবে পাথর ছুঁড়ে মারার শাস্তি পাই না, এবং এভাবে আল্লাহর নির্ধারিত এই দায়িত্ব পরিত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, (অবৈধ) গর্ভাবস্থার পর, অথবা স্বীকারোক্তির পর ব্যাভিচারকারী বিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আল্লাহর কিতাবে পাথর ছুঁড়ে মারা একটি কর্তব্য। (সহিহ মুসলিম বই ১৭, হাদিস নম্বর ৪১৯৪; অনুরূপ হাদিস সহীহ বুখারী খণ্ড ৮, বই ৮২, হাদিস নম্বর ৮১৬; অনুরূপ হাদিস জামে আত-তিরমিযী ১৪৩২; অনুরূপ হাদিস সহীহ, আল-বুখারী ২৪৬২ এবং মুসলিম ১৬৯১ (দারুসসালাম) মুসনাদে আহমাদ ২৪৯)

ইবনে আব্বাস **(**রাঃ**)** থেকে বর্ণিত**,** উমর বিন খাত্তাব **(**রাঃ**)** বলেন**:**

"আমি আশঙ্কা করি যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ কেউ বলবে**: '**আমি আল্লাহর কিতাবে পাথর নিক্ষেপের **(**আয়াত**)** পাই না,' এবং তারা আল্লাহ প্রদত্ত কোন ফরজ ত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হবে। বরং যদি কোন পুরুষ বিবাহিত **(**অথবা পূর্বে বিবাহিত**)** হয় এবং প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়**,** অথবা যদি **(** বিবাহিত মহিলার অবৈধ**)** গর্ভধারণ হয় অথবা যদি সে তা স্বীকার করে তবে পাথর নিক্ষেপ করা বাধ্যতামূলক। আমি **(**কুরআনে**)** এটি পড়েছি। "আর যদি কোন বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা ব্যভিচার করে**,** তাহলে তাদের উভয়কেই পাথর নিক্ষেপ করো।" আল্লাহর রাসূল **(**সাঃ**)** ব্যভিচারীদের পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তার পরে আমরাও পাথর নিক্ষেপ করেছি।" **(**সুনান ইবনে মাজাহ ২৫৫৩**;**অনুরূপ হাদিস বুলুগ আল-মারাম বই ১০, হাদিস ১২৪৮**)**

আমি কোরআনে "আর যদি কোন (বিবাহিত) বৃদ্ধ পুরুষ এবং বৃদ্ধা মহিলা ব্যভিচার করে**,** তাহলে তাদের উভয়কেই পাথর নিক্ষেপ করো।" **-** এই আয়াত না পাবার কারণে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তিকে বাতিল বলে গণ্য করিনি।

আমি নিম্ন লিখিত কারণে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে রজম করাকে বাতিল বলে গণ্য করেছিঃ

১) আলী রাঃ উনার রায়ে ও ফতোয়ায় রজম করাকে সুন্নত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

২) নুমান বিন বশীর রাঃ থেকে বর্ণিত হাদিস (সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬২) থেকে এটা প্রমাণিত যে, সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পর যিনাহ বা ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে ইসলামে আর রজমের বিধান নেই এবং বর্তমানে, সুন্নত হিসেবেও যিনাহ বা ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে রজমের নির্দেশ বা রায় দেয়া যাবে না।

আলোচনা থেকে প্রাপ্ত আরও কিছু সিদ্ধান্ত

ক) সূরা নূরের ১ থেকে ২১ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে এটা পরিষ্কার যে, বিবাহিত এবং অবিবাহিত সকল যিনাহকারীর জন্য ইসলামে আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি একটি আর তা হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত।

খ) বইয়ের সকল আলোচনা শেষে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ সূরা নূর নাযিলের পর আর কোন ব্যভিচারী বা যিনাহকারীর বিচার করেছেন এমন হাদিস আমাদের কাছে নেই। তবে একটি হাদিস আছে যা সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পরের বলে প্রতীয়মান হয়ঃ

সাঈদ বিন সা'দ বিন উবাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি বাস করত, যার শারীরিক ত্রুটি ছিল। আমরা অবাক হয়ে গেলাম যখন তাকে এলাকার একজন দাসীর সাথে অবৈধ যৌনকর্ম করতে দেখা গেল। সা'দ বিন উবাদাহ (রাঃ) তার ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থাপন করলেন, তিনি বললেন: 'তাকে একশ বেত্রাঘাত করো।' তারা বলল: 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), সে এত দুর্বল যে তা সহ্য করতে পারবে না। আমরা যদি তাকে একশ বেত্রাঘাত করি, তাহলে সে মারা যাবে।' তিনি বললেন: "তাহলে একশ শাখা বিশিষ্ট একটি ডাল নিয়ে তাকে একবার আঘাত করো।"

অন্য একটি সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। (সুনান ইবনে মাজাহ ২৫৭৪ সহীহ দারুস সালাম।)

এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়া যায়ঃ

i) এটি সূরা নূরের ২ নাম্বার আয়াত নাযিলের পরের ঘটনা হতে পারে কারণ অন্য সকল হাদিসে অবিবাহিত যিনাহকারীর জন্য শাস্তি আমরা পেয়েছি ১০০ বেত্রাঘাত এবং ১ বছরের জন্য নির্বাসন।

ii) লোকটি বিবাহিত না অবিবাহিত ছিল তা হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে না তাই এই ব্যাপারে কথা না বলাই ভালো।

iii) সূরা নূর নাযিলের পর কঠোর শাস্তি দিয়ে সমাজে অশ্লীলতা বন্ধ করার চেয়ে নারীদেরকে নিয়ে অশ্লীল আলোচনা, কোন নারীকে অপবাদ দেয়া বন্ধ করার মাধ্যমে সমাজে অশ্লীলতা বন্ধে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চিন্তা করে দেখুন, সুনান ইবনে মাজাহ ২৫৭৪ হাদিসে আল্লাহ এর রসূল সাঃ কত সহজে ঐ ব্যক্তির উপর যিনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে বলেছেন। এতে কি যিনাহকারীরা যিনাহ করতে উৎসাহ পাবে? না, উৎসাহ পাবে না কারণ যিনাহ বন্ধে কি করতে হবে তা আল্লাহ এর রসূল সাঃ অন্য হাদিসে বলেছেন যে, যারা বিয়ে করতে পারো তারা বিয়ে করো আর যারা বিয়ে করতে না পারো তারা রোজা রাখো। সুনান ইবনে মাজাহ ২৫৭৪ হাদিসটি নাস্তিকদের মুখ বন্ধ করে দিবে।

এখান থেকে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার যে, যদি যিনাহকারী গ্রামের কোন অপুষ্টিতে ভোগা দরিদ্র নারী বা পুরুষ হয় আর বেত্রাঘাতকারী যদি শক্তিশালী পুরুষ হয় তাহলে সম্ভাবনা আছে যে, উক্ত যিনাহকারী ১০০ টি বেত্রাঘাত দিলে মারা যেতে পারে বা তার স্বাস্থ্যের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে, যেমনঃ ফুস্‌ফুস বা লিভার বা কিডনি বা হার্টের ক্ষতি হতে পারে যা পরবর্তীতে তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যম যদি ডাক্তার বলে যে, ১০০ টি বেত্রাঘাত দিলে সাজাপ্রাপ্ত যিনাহকারীর মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই তাহলেই তাকে ১০০ টি বেত্রাঘাত দিতে হবে অন্যথায় তাকে ১০০ টি শাখাযুক্ত ডাল বা লাঠি দিয়ে ১ বার আঘাত করে শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। আল্লাহ যে বলেছেন, শাস্তি যেন লোকেরা প্রত্যক্ষ করে এটাই হচ্ছে যিনাহের অন্যতম একটা শাস্তি যে, সমাজের চোখে সে যিনাহকারী হিসেবে প্রমাণিত ও লজ্জিত হয়ে গেল, তার সম্মান নষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ সূরা নূর নাযিলের পর কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করে যিনাহ ব্যভিচার বন্ধের চেয়ে সামাজিকভাবে যিনাহ ব্যভিচার প্রতিরোধে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

গ) বর্তমানে কোন নারী বা পুরুষ যদি যিনাহ বা ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিতে আসে তাহলে তার স্বীকারোক্তি শোনা হবে না বরং তাকে বলা হবে যে, আপনি যে অপরাধ করেছেন তা থেকে ক্ষমা পাবার জন্য আপনাকে নিজের উপর হাদ্দের শাস্তি নিতে হবে না; আপনি তওবা করুন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিখুতভাবে পড়ুন তাহলেই আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন। এই ব্যাপারে, পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ) ইসলামী শরিয়াতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি এখন প্রযোজ্য হবে প্রমান সাপেক্ষে বিবাহিত ধর্ষকের বিরুদ্ধে। (নুমান বিন বশীর রাঃ থেকে বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী (সুনান আন-নাসায়ী ৩৩৬২) এবং সুনান আবু দাউদ ৪৩৭৯)

ঙ) মুসলিম শাসক বা মুসলিম সরকার বা খলিফা - কেউ যিনাহ করেছে কি না বা ব্যভিচার করেছে কি না - তা তদন্ত করে খুঁজে বের করে এনে উক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন না। এটা মুসলিম শাসক বা সরকার বা খলিফার কাজ নয়। তবে কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে অবৈধ সঙ্গমের অভিযোগ করে সেক্ষেত্রে মুসলিম শাসক তদন্ত করে দেখবেন অভিযোগ সত্য না মিথ্যা। এই ব্যাপারে বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এখন আমরা জানব,বিবাহিত যিনাহকারী তো বেচে থাকবে, বিবাহিত যিনাহকারীর বিয়ের কি হবে? তার সন্তানের কি হবে?

"এটি একটি সূরা, এটি আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে ফরয করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।(১) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী - নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ’ কশাঘাত (বেত্রাঘাত) করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু’মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২) ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে। (৩) যারা সতী সাধ্বী নারীর উপর অপবাদ দেয়, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর, আর তাদের সাক্ষ্য কক্ষনো গ্রহণ কর না, এরাই না-ফরমান। (৪) অবশ্য এরপর যদি তারা তাওবাহ করে ও সংশোধিত হয়, কেননা আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (৫) আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের উপর অপবাদ দেয়, কিন্তু নিজেদের ছাড়া তাদের অন্য কোন সাক্ষী না থাকে, এ রকম প্রত্যেক লোকের সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। (৬) আর পঞ্চমবারে বলবে যে, সে যদি মিথ্যেবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর লা’নত পতিত হবে। (৭) আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ ক’রে বলে যে, সে (তার স্বামী) অবশ্যই মিথ্যেবাদী। (৮) এবং পঞ্চমবারে বলে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে। (৯) তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে (তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে), আল্লাহ তাওবাহ গ্রহণকারী, বড়ই হিকমতওয়ালা। (১০) সূরা নূর ১-১০)

সূরা নুরের ৬,৭,৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন বিবাহিত যিনাহকারী বিয়ের কি হবে? লি'আনের ক্ষেত্রে যে নিয়ম এই ব্যাপারেও একই নিয়ম হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে কারণ যিনাকারীর

শাস্তি বর্ণনার পর সূরা নূরে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাদের শাস্তির বিধান, তারপর লি'আনের আয়াত পাওয়া যায়। নাযিলের ক্রম দেখলেও এই বিষয়টি পরিষ্কার। সূরা নূরের প্রথমে তিন আয়াত নাযিল হয়েছে তারপর মা আয়েশাকে নির্দোষ ঘোষণা সম্পর্কিত সূরা নূরের ১১-২১ আয়াত নাযিল হয়েছে তারপর লি'আনের আয়াত নাযিল হয়েছে।

বিবাহিত যিনাহকারীর সাথে তার স্বামী বা স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এবং উক্ত যিনাহকারী পরে কোন যিনাহকারীকে বা মুশরিককে বিয়ে করে নিবে। উক্ত যিনাহকারীর সন্তান কার কাছে থাকবে?

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং আবদ বিন যাম'আ (একটি শিশুকে নিয়ে) একে অপরের সাথে ঝগড়া করলেন। নবী (সাঃ) বললেন, "ছেলেটি তোমার জন্য, হে আবদ বিন যাম'আ, কারণ ছেলেটি বিছানার মালিকের জন্য। হে সাওদা! ছেলেটির থেকে পর্দা করো।" বর্ণনাকারী আল-লাইস আরও বলেন (যে নবী (সাঃ) আরও বলেন), "আর যে অবৈধ যৌন মিলন করে তার জন্য পাথর।" (সাহিহ বুখারি ৬৮১৭)

বুঝা গেলো যে, যদি স্বামী যিনাহ করে থাকে তাহলে সন্তান স্ত্রীর কাছে থাকবে আর স্ত্রী যদি যিনাহ করে তাহলে সন্তান স্বামীর কাছে থাকবে কারণ মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "আর যে অবৈধ যৌন মিলন করে তার জন্য পাথর।"।

এখানে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, অবৈধ যিনাহকারীর জন্য পাথর বলতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তির কথা বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) "আর যে অবৈধ যৌন মিলন করে তার জন্য পাথর" বলতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তির কথা বুঝান নি। তাহলে তো এই শাস্তি অবিবাহিতদের জন্যও প্রযোজ্য হয়ে যেত। "আর যে অবৈধ যৌন মিলন করে তার জন্য পাথর।" --- এটি একটি অভিব্যক্তি যেমনঃ আমরা কেউ পরীক্ষায় খারাপ করলে অন্যরা বলে থাকে, "অমুকে পরীক্ষায় ২ টা রসগোল্লা বা ২ টা ডিম পেয়েছে। অর্থাৎ পরীক্ষায় সে ০০ (শূন্য) পেয়েছে। "আর যে অবৈধ যৌন মিলন করে তার জন্য পাথর।"-- বলতে বুঝানো হয়েছে যে, "যে অবৈধ যৌন মিলন করে সে কল্যাণকর (যেমনঃ সন্তান) কিছুই পাবে না"।

অবিবাহিত ধর্ষকের শাস্তিঃ

নাফি' বলেন, আবু 'উবাইদের কন্যা সাফিয়া তাকে জানিয়েছিলেন যে খলিফার (ওমর রাঃ) এক দাস গনীমতের এক পঞ্চমাংশের অধিকার থেকে প্রাপ্ত একজন মেয়ের (দাসীর) সাথে সহবাস করেছিল, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জোর করে তা করতে বাধ্য করেছিল এবং তার কুমারীত্ব নষ্ট করেছিল।

'উমর তাকে (ধর্ষককে) মারধর করেছিলেন কিন্তু (দাসীকে) মারধর করেননি কারণ সে (দাসটি) তাকে (দাসীকে) তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তা করেছিলেন। (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৩৫৮০; অনুরূপ হাদিসঃ মুয়াত্তা ইমাম মালিক আরবি রেফারেন্স : বই ৪১, হাদিস ১৫১৭)

সাফিয়া বিনতে উবাইদ বলেন:

"একজন সরকারি পুরুষ-দাস যুদ্ধের গনীমতের খুমুস থেকে (প্রাপ্ত) একজন দাসীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল, এমনকি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তার কুমারীত্ব নষ্ট করে ফেলেছিল; তাই উমর (রাঃ) আইন অনুসারে তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং তাকে নির্বাসিত করেছিলেন, কিন্তু তিনি দাসীকে বেত্রাঘাত করেননি কারণ পুরুষ-দাস তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে অবৈধ যৌন মিলন করেছিল।" আয-যুহরি একজন স্বাধীন পুরুষ কর্তৃক ধর্ষিত কুমারী দাসী সম্পর্কে বলেছেন: বিচারককে ব্যভিচারীকে মহিলা দাসীর মূল্যের সমান অর্থ জরিমানা করতে হবে এবং ব্যভিচারীকে (ইসলামী আইন অনুসারে) বেত্রাঘাত করতে হবে; কিন্তু যদি দাসী মহিলা মাতৃকা (কুমারী না হয়ে বয়স্ক) হয়, তাহলে ইমামের রায় অনুসারে, ব্যভিচারীকে জরিমানা করা হবে না বরং তাকে (ইসলামী আইন অনুসারে) আইনানুগ শাস্তি পেতে হবে। (সহীহ আল-বুখারী ৬৯৪৯)

উল্লেখিত, হাদিসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যদি ধর্ষক অবিবাহিত হয় তাহলে, তাকে ধর্ষণের জন্য ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে এবং নির্বাসন দেয়া হবে। আয-যুহরি থেকে আমরা কোন ফতোয়া নিতে পারছি না কারণ তিনি কোন হাদিসের উপর ভিত্তি করে ঐ ফতোয়া দিয়েছেন তা আমরা জানি না।

সুনানে আবি দাউদ ৪৩৭৯ নাম্বার হাদিসে উল্লেখিত ধর্ষক ব্যক্তি বিবাহিত ছিলেন না অবিবাহিত ছিলেন তা জানা গেলে এই ব্যাপারে আরও নিশ্চিতভাবে আইন বলা যেত। যেহেতু সেটা এখন পর্যন্ত আমার অজানা তাই অবিবাহিত ধর্ষকের শাস্তি ওমর রাঃ কর্তৃক দেয়া শাস্তিই আমি অবিবাহিত ধর্ষকের জন্য প্রযোজ্য হবে বলে গ্রহন করছি।

ইবনে আব্দুল বার বলেন:

“ধর্ষকদের ব্যাপারে আলেমরা সর্বসম্মতিক্রমে একমত যে, ধর্ষকের বিরুদ্ধে যদি স্পষ্ট প্রমাণ থাকে যে সে হাদ্দ শাস্তির যোগ্য, অথবা যদি সে স্বীকার করে, তাহলে তাকে হাদ্দ শাস্তি দিতে হবে। অন্যথায়, তাকে শাস্তি দিতে হবে (অর্থাৎ, যদি এমন কোন প্রমাণ না থাকে যে কারণে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের জন্য হাদ্দ শাস্তি কার্যকর করা যেতে পারে, এবং চারজন সাক্ষী না থাকে, তাহলে বিচারক তাকে শাস্তি দিতে

পারেন এবং এমন শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন যা তাকে এবং তার মতো অন্যদের নিরুৎসাহিত করবে)। যদি নারীকে জোর করে এবং বল প্রয়োগ করে ধর্ষণ করা হয়, তাহলে তার জন্য কোন শাস্তি নেই, যা ধর্ষিতার চিৎকার এবং সাহায্যের জন্য চিৎকার দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে।" (আল-ইস্তিযকার, ৭/১৪৬) (Al-Istidhkaar, 7/146)

ইবনে আব্দুল বার এর মতামত বর্তমান সময়ের জন্য গ্রহনযোগ্য নয় কারণঃ

১) বর্তমানকালের ধর্ষক কখনো স্বীকার করবে না যে সে ধর্ষণ করেছে।

২) ধর্ষণের জন্য ৪ জন সাক্ষী একজন ধর্ষিতার জন্য যোগাড় করা অসম্ভব ব্যাপার কারণ ৪ জন পরহেজগার মুসলিমের সামনে একজন মেয়েকে একজন ধর্ষক কখনো ধর্ষণ করবে না বা করতে পারবে না।

৩) অস্ত্রের মুখে ধর্ষণ করলে ধর্ষিতার পক্ষে বাধা দেয়া বা চিৎকার করা সম্ভব নয় কারণ ধর্ষক তাকে পিস্তল বা ছুরি দেখিয়ে আগেই বলে দিয়েছে যে, চিৎকার করলে সে ঐ নারীকে হত্যা করে পালিয়ে যাবে।

এইরূপ নিয়ম থাকলে তো একজন ধর্ষিতা ধর্ষণের অভিযোগই করবে না কারণ এতে সে উলটা যিনাহের শাস্তি পাবে এবং তার সম্মান নষ্ট হবে।

তাহলে, সঠিক নিয়ম কি?

ওমর রাঃ এর হাদিসটি পড়লেই সঠিক নিয়ম পাওয়া যাবে।

সহীহ আল-বুখারী ৬৯৪৯ তে ওমর রাঃ যে ধর্ষক দাসকে শাস্তি দিয়েছিলেন সেখানে তিনি কিন্তু ৪ জন সাক্ষী ডেকেছিলেন এমন কোন কথা হাদিসে নেই তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে ওমর রাঃ ঐ দাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণের (circumstantial evidence) ভিত্তিতে ঐ দাসকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

ধর্ষণের ব্যাপারে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের (circumstantial evidence) কথা ইসলামের কোথাও কি বলা আছে? জি বলা আছে, কোরআনে সূরা ইউসুফে বলা আছে।

"তারা উভয়ে (আমীরের স্ত্রী এবং ইউসুফ) দরজার দিকে দৌড় দিল আর স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার (ইউসুফের) জামা ছিঁড়ে ফেলল। এ সময় স্ত্রীলোকটির স্বামীকে (আমীর বা মন্ত্রীকে) তারা দু'জনে দরজার কাছে পেল। মহিলাটি বলল, 'যে তোমার পরিবারের সাথে অপকর্ম করতে চায় তাকে জেলে পাঠানো অথবা ভয়াবহ শাস্তি ছাড়া উপযুক্ত দন্ড কী আর দেয়া যেতে পারে?' (২৫) সে (ইউসুফ) বলল, 'সে-ই আমার থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছে'। তখন মহিলাটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য

দিল- 'যদি তার জামা সম্মুখ দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে মহিলাটি সত্য বলেছে আর সে (ইউসুফ) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। (২৬) আর যদি তার (ইউসুফের) জামা পেছন হতে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে মহিলাটি মিথ্যে বলেছে আর সে সত্যবাদী। (২৭) স্বামী যখন ইউসুফের জামাটি পেছন হতে ছেঁড়া দেখতে পেল, তখন সে বলল, 'এ সব হল তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের কূট কৌশল বড়ই কঠিন। (২৮) ওহে ইউসুফ! তুমি ব্যাপারটা উপেক্ষা কর, আর ওহে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও, প্রকৃতপক্ষে তুমিই অপরাধী।' (২৯) (সূরা ইউসুফ ২৫-২৯)

সুতরাং ধর্ষণ প্রমাণের জন্য ধর্ষকের স্বীকারোক্তি বা ৪ জন সাক্ষী দরকার নেই। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (circumstantial evidence), DNA test (Forensic test), CCTV footage, ইত্যাদিই যথেষ্ট। এখানে আরও কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার।

ক) অনেক দিনের প্রেমের ফলে দু'জন স্বেচ্ছায় অবৈধ সঙ্গম করার পর কোন কারণে নারী পুরুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা ধর্ষণের অভিযোগ করতে পারে। এক্ষেত্রে বিচারক এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন যে, অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত পূর্ব পরিচিত কি না - তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল কি না? ইত্যাদি।

খ) ধর্ষিতাকে ধর্ষক উত্ত্যক্ত করত এই রকম কোন প্রমাণ এলাকাবাসী দেয় কি না?

গ) রাতে মেয়েটি অফিস থেকে বের হলে রাস্তায় বা গ্রামের ক্ষেত্রে কোন মেয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে (প্রস্রাব করতে বের হলে) রাতে ঘর থেকে বের হলে অপরিচিত লোক বা গ্রামের লোক তাকে ধর্ষণ করেছে কি না? ইত্যাদি।

ঘ) ধর্ষণে প্রমাণের জন্য বর্তমান বাংলাদেশে ফৌজদারি আদালতে যে সকল পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (circumstantial evidence) ব্যাবহার করা হয় তা শরিয়া কোর্টেও ব্যাবহার করা যাবে কারণ অভিযোগ প্রমাণের জন্য এগুলি ব্যাবহার করা হচ্ছে কিন্তু বিচার করা হচ্ছে আল্লাহ এর আইনে সুতরাং এতে কোন গুনাহ হবে না।

ঙ) পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (circumstantial evidence) যিনাহ বা ব্যভিচার প্রমাণের জন্য ব্যাবহার করা যাবে না। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (circumstantial evidence), DNA test (Forensic test), CCTV footage, ইত্যাদি যিনাহ বা ব্যভিচারের জন্য ব্যাবহার করা যাবে না এই কারণে যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ এই ধরণের অপরাধী স্বীকারোক্তি দিতে আসলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন বা চলে যেতে বলতেন। কোন নারীকে যিনাকারী বা ব্যভিচারী হিসেবে প্রমান করার কোন প্রয়োজন বা দায়িত্ব ইসলামী সরকারের নাই বরং ইসলামী সরকার চেষ্টা করবে যেন যিনাহ এবং ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত না হয়। এই ব্যাপারে বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কোরআনে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (circumstantial evidence)

ব্যাবহারের কথা ধর্ষণ প্রমাণের ব্যাপারে বলা হয়েছে (সূরা ইউসুফ) কিন্তু যিনাহ ব্যভিচারের ব্যাপারে বলা হয়নি।

তাহলে, আমার মতে, অবিবাহিত ধর্ষক যে হটাত করে নিজের যৌন চাপ সামলাতে না পেরে ধর্ষণ করে ফেলেছে তার জন্য শাস্তি হচ্ছে ১০০ বেত্রাঘাত এবং নির্বাসন। কিন্তু এমন কোন বিবাহিত বা অবিবাহিত ধর্ষক যদি থাকে যে কোন মেয়েকে অস্রের মুখে তুলে নিয়ে বা অন্য কোন ভাবে জোর করে তুলে নিয়ে অর্থাৎ অপহরণ করে কোথাও আটকে রেখে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে তাহলে আলেমদের মতামত হচ্ছে তার বিচার কোরআনের সূরা মায়িদার ৩৩ নাম্বার আয়াত অনুযায়ী করতে হবে।

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটাই তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।" [আল-মায়িদাহ ৫:৩৩]

উক্ত ধর্ষণকারীর বিচার কিন্তু শুধু ধর্ষণের জন্য হচ্ছে না তার বিচার হচ্ছে ভূখণ্ডে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, ত্রাসের পরিস্থিতি তৈরি করার কারণে।

এখানে আরেকটি বিষয় বুঝার আছে যে, যে ব্যক্তি বা সংঘবদ্ধ দল কোন মেয়েকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করবে তারা কোন সাধারণ জনসাধারণ নয় তারা সন্ত্রাসী দল হবে বা তাদের সদস্য বা নেতা হবে কিন্তু এই ধরণের দল বা সন্ত্রাসী তো শরিয়া আইন কার্যকর কোন ভূখণ্ডে থাকতেই পারবে না কারণ সন্ত্রাসীরা এই রকম ভূখণ্ডে সন্ত্রাসী করবে কিভাবে যেখানে চুরি করলে হাত কেটে দেয়া হয়, হাইওয়ে ডাকাতি করলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়,ইত্যাদি। তাই, কোন মেয়েকে কেউ তুলে নিয়ে ধর্ষণ করবে এমন সম্ভাবনা ইসলামী শরিয়া কার্যকর কোন ভূখণ্ডে হবার সম্ভাবনা খুব-ই কম।

ইমাম মালিক বলেন, "যে মহিলা গর্ভবতী এবং তার স্বামী নেই এবং সে বলে, 'আমাকে জোর করে করা হয়েছিল,' অথবা সে বলে, 'আমি বিবাহিত ছিলাম', তার সম্পর্কে আমাদের মতামত হল, তার কাছ থেকে এটি গ্রহণ করা হবে না এবং তার উপর হাদ্দ আরোপ করা হবে যদি না তার কাছে বিবাহ সম্পর্কে তার দাবির স্পষ্ট প্রমাণ থাকে অথবা তাকে জোর করে করা হয়েছিল, অথবা যদি সে কুমারী হয় তবে তার রক্তপাত হয় অথবা সে সাহায্যের জন্য ডাকে যাতে কেউ তার কাছে আসে এবং সে সেই অবস্থায় থাকে অথবা যৌন নির্যাতনে যে রকম পরিস্থিতি হয় তার সাথে তার অবস্থা সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।" তিনি

বলেন, "যদি সে এর কোনটিই উপস্থাপন না করে, তাহলে তার উপর হাদ্দ আরোপ করা হবে এবং সে যা দাবি করে তা তার কাছ থেকে গৃহীত হবে না।"

মালিক বলেন, "ধর্ষিতা মহিলা বিবাহ করতে পারবে না যতক্ষণ না সে তিনটি মাসিকের মাধ্যমে নিজেকে পরিষ্কার করে।" (ধর্ষণের ফলে গর্ভে বাচ্চা এসেছে কি না- সেটা নিশ্চিত হবার জন্য)

তিনি বলেন, "যদি সে তার মাসিকের বিষয়ে সন্দেহ করে, তবে সে বিবাহ করবে না যতক্ষণ না সে নিজেকে সেই সন্দেহ থেকে মুক্ত করে।"(USC-MSA (ইংরেজি) রেফারেন্স বই ৪১, হাদিস ১৬)

ইমাম মালিক একজন বিখ্যাত হাদিস সংগ্রাহক। তিনি মুয়াত্তা ইমাম মালিক নামে হাদিস গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। আল্লাহ উনাকে উত্তম প্রতিদান দেক। একজন নারী যে গর্ভবতী সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে কি কি করতে হবে তার সম্পর্কে ইমাম মালিক উনার ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন। ইমাম মালিকের উক্ত মতামতের ভিত্তি হিসেবে কোন হাদিস বা কোরআনের কোন আয়াত উক্ত হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি। এটি উনার ব্যক্তিগত মতামত। বর্তমানকালে উনার এই মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। কোন মেয়ে যদি বলে যে, ৮-৯ মাস আগে রাতে অস্ত্রের মুখে কেউ তাকে ধর্ষণ করেছিল যাকে বা যাদেরকে সে চিনতে পারেনি তাহলেই সেই মেয়ে নির্দোষ বলে প্রমাণিত হবে। তখন (৮-৯ মাস আগে) সেই মেয়ে লজ্জায় বা ভয়ে বলতে পারেনি। ঐ মেয়ে যিনাহে লিপ্ত ছিল তা যদি অন্য কোনভাবে প্রমাণ করা না যায় (যেমন ৪ জন সাক্ষী) তাহলে সেই মেয়ে নির্দোষ বলে রায় পাবে। সুরা নূর নাযিলের পর একটি মেয়ের সম্মান রক্ষাই অগ্রাধিকার পাবে। মুহাম্মাদ সাঃ এবং আলী রাঃ এর রজমের হাদিসগুলো যারা বুঝে বুঝে পড়বেন এবং হাদিসের মর্মার্থ বুঝতে পারবেন তারা আমার সাথে একমত হবেন। আল্লাহ এর রসূল সাঃ কাউকে যিনাহকারী হিসেবে প্রমাণে বা রজম করায় বা হাদ্দের শাস্তি প্রয়োগ করায় উদগ্রীব ছিলেন না বরং তিনি স্বীকারোক্তি দিতে আসা লোকদের ফিরিয়ে দিতেন। আলী রাঃ মুহাম্মাদ সাঃ এর এই নীতিই অনুসরণ করেছেন। সুতরাং, গর্ভবতী নারীর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে যে সকল শর্ত ইমাম মালিক দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। আমার মতামতের পক্ষে প্রমাণ নিম্নের হাদিসটিঃ

বুরাইদা বর্ণনা করেছেন যে, মাইজ বিন মালিক রাঃ নবীর কাছে এসে বললেন, “আমাকে পবিত্র করুন, হে আল্লাহর রাসূল।” তিনি (সাঃ) বললেন, “এখান থেকে চলে যান! ফিরে যান, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাঁর দিকে তওবা করুন।” তিনি (বুরাইদা) বললেন, তিনি (মাইজ) খুব বেশি দূরে ফিরে যাননি, তারপর এসে বললেন, “আমাকে পবিত্র করুন, হে আল্লাহর রাসূল,” এবং নবী আগের মতোই বললেন। চতুর্থবার যখন এইভাবে চলতে থাকে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, “আমি আপনাকে

পবিত্র করার জন্য কী করব?” তিনি উত্তর দেন যে, এটি ব্যভিচারের জন্য। আল্লাহর রাসূল জিজ্ঞাসা করেন যে, লোকটি কি পাগল ছিল, এবং যখন তাকে বলা হয় যে সে তা নয়, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কি মদ পান করেছে। এক ব্যক্তি উঠে তার নিঃশ্বাসের গন্ধ পেল কিন্তু মদের গন্ধ পেল না, তাই নবী তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কি ব্যভিচার করেছে, এবং যখন সে উত্তর দেয় যে, সে করেছে, তখন তিনি তার ব্যাপারে আদেশ দেন এবং তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। দুই বা তিন দিন পর আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এসে বললেন, “মাইজ বিন মালিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। সে এতটাই তওবা করেছে যে, যদি তা কোন জাতির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে তা তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।” এরপর আজদ গোত্রের এক শাখা গামিদের মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেন, “আমাকে পবিত্র করুন, আল্লাহর রাসূল।” তিনি (সাঃ) বললেন, “এখান থেকে যান! ফিরে যান, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তাঁর দিকে তওবা করুন।” তিনি (ঐ মহিলা) বললেন, “যখন আমি ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী, তখন কি আপনি আমাকে মাইজ বিন মালিকের মতো ফেরত পাঠাতে চান?” তিনি (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি (ঐ মহিলা) কি নিজের কথা বলছেন, এবং যখন তিনি (ঐ মহিলা) উত্তর দিলেন যে, তিনি নিজেই, তখন তিনি (সাঃ) তাকে (ঐ মহিলাকে) তার গর্ভে যা আছে তা প্রসব না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। আনসারদের একজন তার গর্ভে যা আছে তার দায়িত্ব নিলেন, এবং তারপর নবী (সাঃ) এর কাছে গিয়ে বললেন যে গামিদের মহিলা একটি সন্তান প্রসব করেছে। তিনি (সাঃ) বললেন, “তাহলে আমরা তাকে পাথর মারবো না এবং তার সন্তানকে এমন শিশু অবস্থায় রেখে যাব না যে তাকে কেউ দুধ পান করাবে না।” তখন একজন আনসার উঠে বললেন, "আমি তার দুধ পানের জন্য দায়ী থাকব, আল্লাহর নবী।" তারপর তিনি তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করলেন। অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি (সাঃ) তাকে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত চলে যেতে বললেন, তারপর যখন তিনি তা করলেন, তখন তিনি (সাঃ) তাকে বললেন, "যাও এবং তাকে দুধ পান করাও যতক্ষণ না সে তাকে দুধ পান করায়।" যখন তিনি (ঐ মহিলা) তাকে দুধ পান করালেন, তখন তিনি (ঐ মহিলা) ছেলেটিকে তার কাছে নিয়ে এলেন এবং তার হাতে একটি রুটি নিয়ে বললেন, "আমি ওকে দুধ পান করানো ছেড়ে দিয়েছি এবং সে খাবার খেয়েছে।" তিনি (সাঃ) (ছেলেটিকে একজন মুসলিমের হাতে তুলে দিলেন, এবং যখন তিনি (সাঃ) তার ব্যাপারে আদেশ দিলেন এবং তাকে তার বুকের কাছে একটি গর্তে পুঁতে রাখা হল, তখন তিনি (সাঃ) লোকদের তাকে পাথর ছুঁড়ে মারার নির্দেশ দিলেন। খালিদ বিন আল-ওয়ালিদ একটি পাথর নিয়ে এগিয়ে এলেন যা তিনি তার মাথায় ছুঁড়ে মারলেন, এবং যখন তার মুখ থেকে রক্ত ঝরতে লাগল, তখন তিনি (খালিদ) তাকে (ঐ মহিলাকে) অভিশাপ দিলেন। কিন্তু নবী (সাঃ)

বললেন, "ভদ্রভাবে, খালিদ, যার হাতে আমার প্রাণ, সে এতটাই তওবা করেছে যে, যে অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত কর আদায় করে, সেও ততটুকু তওবা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে।" তারপর তার ব্যাপারে আদেশ দিয়ে তিনি (সাঃ) তার (ঐ মহিলার) জন্য নামাজ আদায় করলেন এবং তাকে দাফন করা হল। মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন। ১. আরবি ভাষায় তৃতীয় ব্যক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে সে গর্ভবতী ছিল। এটি একটি ব্যাখ্যামূলক বাক্যাংশ হতে পারে, তবে আমি এটিকে মহিলার শব্দের অংশ হিসাবে বিবেচনা করার সাহস করেছি কারণ এতে বাক্যটিকে আরও সহজে পড়া যায়। ২. সাহিব মাকস। মাকস ছিল প্রাক-ইসলামিক যুগে বাজারে বিক্রেতাদের কাছ থেকে নেওয়া অর্থ; এটি কর আদায়কারীর দ্বারা অতিরিক্ত কিছু নেওয়াকেও বোঝায়। যুগলবন্দী। (মিশকাত আল-মাসাবিহ ৩৫৬২)

অবিবাহিত বা বিবাহিত যে কেউ যিনাহ করলে তা যদি প্রমাণিত হয় ৪ জন সাক্ষীর মাধ্যমে অথবা গর্ভ ধারণের মাধ্যমে অথবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তাহলে তাকে শাস্তি হিসেবে ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে। কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে যিনাহের বা ব্যভিচারের অভিযোগ করে তাহলে ৪ জন সাক্ষীর মাধ্যমে যিনাহ বা ব্যভিচার প্রমাণ করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত শর্ত পূর্ণ করতে হবেঃ

শর্ত সমূহঃ

১) "জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন:

ইহুদীরা তাদের একজন পুরুষ এবং একজন মহিলাকে নিয়ে এসেছিল যারা ব্যভিচার করেছিল। তিনি বললেন: আমার কাছে দুজন জ্ঞানী পুরুষ অথবা তোমার জ্ঞানী পুরুষকে নিয়ে এসো। তাই তারা সুরিয়ার দুই পুত্রকে নিয়ে এসেছিল। তিনি তাদের শপথ করিয়ে বললেন: যদি এই দুই ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেয় যে তারা তার যৌনাঙ্গকে তার স্ত্রীলিঙ্গে (প্রবেশিত) দেখতে পেয়েছে, যেমন একটি রজত কাঠি খাপে আটকানো থাকে, তাহলে তাদের পাথর মেরে হত্যা করা হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এমন কি আছে যা তোমাদের তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করতে বাধা দেয়? তারা বলল: আমাদের আইন চলে গেছে, তাই আমরা হত্যাকে অপছন্দ করেছি। এরপর আল্লাহর রাসূল সাঃ চারজন সাক্ষীকে ডেকে পাঠালেন। তারা চারজন সাক্ষীকে নিয়ে এলেন। তারা সাক্ষ্য দিলেন যে তারা তার (পুরুষের) যৌনাঙ্গকে তার স্ত্রীলিঙ্গে (প্রবেশিত) দেখতে পেয়েছে যেমন একটি রজত কাঠি খাপে আটকানো থাকে (সুরমা বা কাজলদানিতে কাঠি/শলাকা যেরকম ঢুকানো থাকে)। এরপর নবী (সাঃ) তাদের পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন"। (সুনান আবু দাউদ ৪৪৫২)

চারজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে সাক্ষী দিতে হবে যে, তারা কোন নারীর গোপন অঙ্গে কোন পর পুরুষের গোপন অঙ্গ ঢুকানো অবস্থায় দেখেছে অর্থাৎ অঙ্গগুলোকে এমন ভাবে দেখতে হবে যে, নারীর গোপন অঙ্গে পুরুষের গোপন অঙ্গ ঢুকানো অবস্থায় আছে। বর্তমান সমাজে, এই রূপ দেখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার কারণ কেউই চারজন পুরুষের সামনে একজন পর নারীর গোপন অঙ্গে নিজের গোপন অঙ্গ ঢুকিয়ে রাখবে না।

২) যদি এমন হয় যে, ১০ জন পুরুষ বা তারও বেশি সাক্ষী দেয় যে, একজন পুরুষ একজন পর নারীকে নিয়ে হোটেলে বা কোন ঘরে ছিল তারা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখেছে যে, নারী পুরুষ ঘেমে আছে এবং বুঝা যাচ্ছে যে তারা সঙ্গম করেছে, তাহলেও তাদের কোন শাস্তি হবে না কারণ ঐ সাক্ষীরা পুরুষের গোপন অঙ্গ নারীর গোপন অঙ্গে ঢুকানো অবস্থায় দেখেনি।

কাজি বা বিচারক সব সময় চেষ্টা করবেন যেন অভিজুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত না হয় বা খুবই ক্ষুদ্র সন্দেহ থাকলেও সাক্ষীদের সাক্ষ্য বাতিল করে দিবেন। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে, নবী সাঃ ব্যভিচারের সাক্ষ্য নিতে চাইতেন না - তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন, চলে যেতে বলতেন। আয়েশা রাঃ এর ইফকের ঘটনার পর কোরআনের যে ১০ টি আয়াত নাযিল হয় তারপর একজন নারীর সম্মান রক্ষা করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অহেতুক কেউ যেন যিনাহকারী বা ব্যভিচারী হিসেবে সমাজের সামনে লজ্জিত না হয় এজন্য বিশেষ নজর দিবেন বিচারক। তাছাড়া যদি একজন সাক্ষী মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে অভিযোগকারীসহ ৪ জন সাক্ষীই ৮০টি করে বেত্রাঘাত পাবেন এবং আর কখনোই কোন ব্যাপারে তাদের সাক্ষী আর গ্রহন করা হবে না। অন্যদিকে যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে ব্যভিচারী ব্যক্তি ১০০ বেত্রাঘাত পাবে। এই রুপ অবস্থায় কেউই হয়তো অন্যের বিরুদ্ধে যিনাহ বা ব্যভিচারের অভিযোগ নিয়ে আদালতে যাবে না।

একজন সতী, নিরপরাধ নারীর সম্মান, মর্যাদা রক্ষায় আল্লাহ এর দেয়া আইনের চেয়ে ভালো কোন আইন কি হতে পারে? না, পারে না।

আল্লাহ মাইজ বিন মালিক (রাঃ) ও গামিদের মহিলাকে (রাঃ) জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুক। কবুল করুন হে আসমান জমিনের রব।

ইসলামী শরিয়া আইনেঃ

ক) বিবাহিত, অবিবাহিত সকল যিনাহকারীর জন্য, অপরাধ প্রমাণ সাপেক্ষে, শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত।

খ) বিবাহিত ধর্ষকের শাস্তি, অপরাধ প্রমাণ সাপেক্ষে, রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যা।

গ) অবিবাহিত ধর্ষক যে যৌনতার চাপে পড়ে ধর্ষণ করে ফেলেছে তার জন্য শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত এবং নির্বাসন।

ঘ) বিবাহিত বা অবিবাহিত ধর্ষক যে কোন মেয়েকে যে কোন ভাবে অপহরণ করে দিনের পর দিন আটকে রেখে ধর্ষণ করেছে তাকে জমিনে/রাষ্ট্রে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, ত্রাস তৈরির কারণে সূরা আল-মায়িদা এর ৩৩ নাম্বার আয়াত অনুযায়ী শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তবে এজন্য শক্ত ও অকাট্য প্রমাণ লাগবে। এখানে শুধু ধর্ষণের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না বরং জমিনে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, ত্রাস তৈরির কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

আমি এই বইয়ে এখন পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা করেছি তার সাথে অনেকে একমত হবেন আবার অনেকে একমত হবেন না। চুরির শাস্তি, মদপানের শাস্তি, আল্লাহ এবং তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শাস্তি, যিনাহ ব্যভিচারের শাস্তি, ধর্ষণের শাস্তি, হাইওয়েতে ডাকাতির শাস্তি, ধর্ম ত্যাগের ব্যাপার, হত্যার শাস্তি, শারীরিক ক্ষতি করার শাস্তি, ইত্যাদি ব্যাপারে, কোরআন হাদিস থেকে নতুন করে সকল আইন, কানুন খুঁজে বের করতে হবে। এই সকল আইন কানুনের ভিত্তি হবে কোরআন এবং হাদিস। এমন যেন না হয় যে - অমুক ইমাম এই কথা বলেছেন তাই আমরা এই আইন মানব – তাহলে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারব না। যারা এই কাজটি করবেন তারা প্রতিটি আইনের ব্যাপারে কোরআনে যত আয়াত আছে তা উল্লেখ করবেন, উক্ত ব্যাপারে সকল হাদিস উল্লেখ করবেন তারপর উক্ত ব্যাপারে কোরআনের সকল আয়াত এবং হাদিস বিশ্লেষণ করে কি আইন সমাজে প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন তা লিখবেন। সাধারণ মানুষকে বা মুসলিমদের জানাতে হবে যে, কোরআন -হাদিসে কি আছে তারপর আইনের কথা বলতে হবে। কোরআনের আয়াত না বলে বা সকল হাদিস উল্লেখ না করে আইন বললে মানুষ তা কখনো গ্রহন করবে না। জাকির নায়েক কেন এত গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন? কারণ তিনি কোরআনের আয়াত এবং হাদিস বলতেন হাদিসের রেফারেন্সসহ ফলে মানুষ তাকে বিশ্বাস করেছিল। মনে রাখবেন, আপনি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফি বা অন্য কোন আলেমের কথা বলে, ফতোয়া বলে কখনো মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারবেন না কারণ একজন মানুষ মুসলিম হয়েছে কোরআনকে এবং মুহাম্মাদ সাঃ কে বিশ্বাস করে। তার অন্তরে কোরআনের প্রতি এবং নবীর সাঃ প্রতি ইসলামের ব্যাপারে যতটুকু বিশ্বাস আছে তা অন্য কোন মানুষের প্রতি নেই। আপনি হানাফি মাজহাবের কথা বলে বা ইমাম শাফির কথা বলে কখনো মানুষের

অন্তরে ঢুকতে পারবেন না। মানুষের অন্তর ঢুকতে হলে আপনাকে কোরআনের আয়াত এবং নবীর হাদিস বলতে হবে।

আমার একার পক্ষে ইসলামের বা ইসলামী রাষ্ট্রের বা ইসলামী শরিয়া আইনের সকল আইন কোরআন হাদিস থেকে বের করা সম্ভব নয় আর এতে ভুল হবার সম্ভাবনা প্রবল। এজন্য এমন কিছু জ্ঞানী লোককে এই কাজটি করতে হবে যে, যদি তাদের মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামী শরিয়া আইন এই দেশে প্রতিষ্ঠা করায় তাহলে তারা কোরআন, হাদিস মোতাবেক কি কি আইন দেশে চালু করবেন তা বই আকারে লিখে আগে মানুষকে জানাতে হবে। মানুষের মতামত নিতে হবে, মানুষ যদি আইন আরও সহজ চায় তাহলে কোরআন, হাদিস খুঁজে দেখতে হবে যে, আইন আরও সহজ করা যায় কি না? একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন, ইসলামে নিয়ম হচ্ছে চুরি করলে চোরের হাত কাটতে হবে কিন্তু মানুষ এই আইন এখন চাচ্ছে না তাহলে কি করা যায়? এটা খুঁজে দেখতে হবে। ওমর রাঃ খলিফা অবস্থায় একবার ১ বছরের জন্য চোরের হাত কাটার আইনটি প্রয়োগ বন্ধ রেখেছিলেন বিশেষ করে খাদ্য চুরির ক্ষেত্রে, তখন দুর্ভিক্ষের সময় ছিল। এই রূপ কোন কিছু করার নির্দেশ হয়তো আপনি সরাসরি কোরআনে বা হাদিসে পাবেন না তবে পরোক্ষভাবে বলা আছে। যেমনঃ

আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত

নবী (সাঃ) বলেছেন, "মানুষের জন্য (ধর্মীয় বিষয়াদি) সহজ করো, তাদের জন্য কঠিন করো না এবং তাদের সুসংবাদ দাও এবং তাদের (ইসলাম থেকে) পালিয়ে যেতে বাধ্য করো না।" (সাহিহ বুখারি, খণ্ড ১, বই ৩, সংখ্যা ৬৯)

একটি জনগোষ্ঠীর উপর ইসলামের আইন পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করার জন্য একজন শাসক ১০ বছর সময় পাবেন বলে আমি মনে করি কারণ প্রথমবার যখন কোরআনকে কোন জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহন করেছিল তখন আল্লাহ তাদেরকে ১০ বছর সময় দিয়েছিলেন (নবী সাঃ মদিনায় যাবার পর যখন প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন তখন কোরআনের সকল আইন আসা শেষ হতে প্রায় ১০ বছর সময় লেগেছিল)। আল্লাহ চাইলে, পুরা কোরআন এক দিনে নাযিল করে বলতে পারতেন যে, ১ দিনের ভিতরে কোরআন সমাজে বাস্তবায়ন করুন। কিন্তু আল্লাহ তা করেন নি। তিনি মানুষকে সময় দিয়েছেন। এভাবেই যে অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই সে অঞ্চলে প্রথমবার ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝা যাক। ধরুন ইসলামী সরকার বা মুসলিম শাসক ঠিক করলেন যে, ধূমপান এই ভূখণ্ডে আর কাউকে করতে দিবেন না। এই সম্পর্কিত আদেশ যদি তিনি এক দিনেই দিয়ে দেন তাহলে মানুষ ইসলামী শরিয়া আইনের বিরুদ্ধেই দাড়িয়ে যাবে বা খলিফার বিরুদ্ধে লেগে যাবে। এই রকম সিদ্ধান্তে ইসলামী সরকার ঝুকির মধ্যে পড়বে তাহলে কি করা যায়? ধীরে ধীরে ধূমপান বন্ধ করতে হবে। যেমন প্রথম ১ বছর প্রতি সপ্তাহে ১ দিন টিভিতে ধূমপানের ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করবেন আলেম, ওলামারা এবং ডাক্তাররা। তারপর সিগারেটের বিক্রয় কেন্দ্র কমিয়ে দিতে হবে। যেমনঃ একটি গ্রামে যদি ৫০ টি দোকানে সিগারেট পাওয়া যায় তখন নির্দিষ্ট কিছু দোকানে সিগারেট পাওয়া যাবে, ৬ মাস পরে প্রতিটি গ্রামে আর পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে ২ টি গ্রামের জন্য একটি দোকানে। তার ৬ মাস পর উপজেলা শহরের দোকানে সিগারেট পাওয়া যাবে কিন্তু গ্রামে আর পাওয়া যাবে না এবং মানুষকে বলা হবে যে, ৬ মাস পর সিগারেট নিষিদ্ধ করা হবে তাই তারা যেন সিগারেট খাওয়া কমিয়ে দেয়। এভাবে ধীরে ধীরে একটি সমাজকে ইসলামের দিকে আনতে হবে। যদি জনগণ সিগারেট ছাড়ার জন্য আরও ৬ মাস সময় চায় তাহলে তাদেরকে আরও ৬ মাস সময় বাড়িয়ে দিতে হবে।

আল্লাহ এর রসূল সাঃ সাকিফের লোকদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, যখন তারা ইসলাম গ্রহন করবে তখন তারা যাকাত দিবে, জিহাদ করবে। নবীর এই কথার ভিতরেই বিজ্ঞতা লুকিয়ে আছে। নবী (সাঃ) যেহেতু তাদেরকে কথা দিয়েছিলেন যে, তাদেরকে যাকাত দিতে হবে না এবং জিহাদ করতে হবে না --- তাহলে নবী (সাঃ) কখনো তাদেরকে জোর করে এই দুটি কাজ করাবেন না। তাহলে নবী সাঃ তো ওয়াদা ভঙ্গকারি হয়ে যাবেন। তাহলে তারা যে পরবর্তীতে জিহাদ করেছে এবং যাকাত দিয়েছে সেটা কিভাবে হয়েছে? তারা স্বেচ্ছায়-ই দিয়েছে। এটা কিভাবে হয়েছে? ধরুন, এমন একটি ঝুঁকি আছে যে, এই অঞ্চলে ইসলামী শরিয়া চালু করতে চাইলে মানুষ চোরের হাত কাটার আইনটি মানতে চাইবে না। তারা যে সবাই চুরি করবে ব্যাপারটা এমন নয়। কিন্তু তারা এই রকম আইনে অভ্যস্ত নয়। তারা আতংকিত। ফলে তারা বলতে পারে যে, ৫ লাখ টাকার কম চুরি করলে কারো হাত কাঁটা যাবে না (***)। মুসলিম শাসক তা মেনে নিলেন। এই রাষ্ট্রে মেয়েদের কেউ জোর করে হিজাব করায় না, মেয়েরা চাকরী করছে, লেখাপড়া করছে, রাষ্ট্রে কারো ইচ্ছা করলে কেউ গান শুনে, নাটক সিনেমা দেখে, সিনেমা হলও আছে ইত্যাদি। রাষ্ট্রে চুরি নেই, ডাকাতি নেই, ধর্ষণ নেই, দুর্নীতি নেই, জুলুম নেই, চাঁদাবাজি, দখলদারি নেই, ন্যায় বিচার আছে। তখন অন্য কোন দেশ ইসলামি শরিয়া আইন এই ভূখণ্ডে বন্ধ করতে এই দেশের উপর হামলা করে দিলে দেখবেন যারা শর্ত দিয়েছিল যে, "৫ লাখ টাকার কম চুরি করলে কারো হাত

কাটবেন না" - তারাই এই রাষ্ট্রে শরিয়া আইনকে বাচাতে জীবন দিতে সবার আগে এসে হাজির হয়েছে। কারণ অন্য কোন দেশ তার ভূখণ্ডে হামলা করলে তাতে তার আত্মসম্মান বোধে আঘাত লাগবে। তখন তার কথা হবে যে, আমরা আমাদের দেশে ইসলামী শরিয়া আইন চালু করেছি তাতে তোর কি ? তুই কেন আমার দেশে হামলা করলি? তোর কথায় কি আমরা চলব ? তোর কথায় কি আমরা ইসলামি শরিয়া আইন বাতিল করে দিবো? এই বলে যারা চোরের হাত কাটার জন্য কমপক্ষে ৫ লাখ টাকা চুরির শর্ত দিয়েছিল তারাই ঐ হামলাকারী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে। মানুষ এমন-ই। হাসিনার পতনের কথা চিন্তা করে দেখুন। ছাত্ররা খুব ছোট একটি দাবী নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল কিন্তু তাদের মধ্যেকার ৪-৫ জনকে হত্যা করার ফলে তারা হাসিনাকে গদি থেকেই নামিয়ে দিল। উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েরা রাস্তায় নেমে এলো এই কথা বলে যে - তুই আমার ভাইরে মারছিস – তোর এত বড় সাহস। তোকে আর সরকারে থাকতেই দিবো না - জীবন গেলে যাবে তবু তোকে সরকারে থাকতেই দিবো না। মানুষ এমন-ই। জোর করে আপনি তাকে দিয়ে কিছু করাতে পারবেন না বা জোর করে তার উপর আপনি কিছু চাপিয়েও দিতে পারবেন না।

(***) একজন মুসলিম শাসক বাস্তবেই এটা করতে পারেন যদি তিনি দেখেন যে, এতে একটি অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে। চুরি করলে চোরের হাত কাটার আইন বাতিল করা হচ্ছে না কিন্তু কত টাকা চুরি করলে হাত কাঁটা হবে তার সীমা বাড়িয়ে দেয়ার দাবী তারা করেছে। যেহেতু আল্লাহ এর রসূল সাঃ ৫ ওয়াক্ত নামাজের বদলে ২ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার শর্তে একজনের থেকে বায়াত নিয়েছিলেন তাহলে চুরির ক্ষেত্রে হাত কাটার জন্য সম্পদের সীমা বাড়িয়ে দিলে আশা করা যায় যে মুসলিম শাসকের গুনাহ হবে না কারণ এই শর্ত ছাড়া তারা যে ইসলামী শরিয়া আইন-ই গ্রহন করছে না ফলে রাষ্ট্রে ইসলামী শরিয়া আইন চালু যাচ্ছে না। এজন্য কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও বড় জিনিস হাসিল করতে হবে। আর বড় জিনিসটা হচ্ছে, এই জনগোষ্ঠী মেনে নিয়েছে আল্লাহ একমাত্র রব, একমাত্র আইনদাতা, মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর রসূল। ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফাকে তারা তাদের সরকার প্রধান হিসেবে মেনে নিয়েছে। গণতন্ত্রের শিরককে তারা অস্বীকার করে ইসলামী শরিয়া আইনের কিছু বিষয়ে, খলিফার অনুমতি নিয়ে, কিছু ছাড় তারা নিচ্ছে। আল্লাহ চাইলে, এই বিষয়ে খলিফা বা মুসলিম শাসক তাদেরকে ছাড় দিলে খলিফার কোন গুনাহ হবে না।

চুরি করলে হাত কাটার যে আইন ইসলামে তাতে অনেক শর্ত আছে। শর্তগুলো বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেয়াও আছে। কিন্তু সেখান থেকে কপি করে এখানে লিখে দিলে কোন লাভ নাই। আমাদেরকে নতুন

করে কোরআন এবং হাদিস নিয়ে বসতে হবে। নতুন করে কোরআন এবং হাদিস থেকে সবচেয়ে সহজ করে শরিয়া আইন লিখতে হবে তারপর তা মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে; তাদের মতামত নিতে হবে। প্রয়োজনে অনেক জায়গায় ছাড় দিতে হবে। এভাবে মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে, ইসলামী শরিয়া আইন সম্পর্কে আলোচনা হবে, জ্ঞানের বিতরণ হবে, মানুষের ভুল ধারণা কেটে যাবে তখন মানুষ ইসলামী শরিয়া আইন সম্পর্কে আগ্রহী হবে। এখন আপনি যদি মনে করেন যে, হানাফি মাজহাব অনুযায়ী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করব তাহলে এই ভূখণ্ডে আপনি বা আপনারা ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন এমন সম্ভাবনা খুবই কম। গত ৫০ বছরে পারেন নি। যেভাবে গত ৫০ বছর গেছে সেভাবে আরও ৫০ বছর গেলেও আপনি বা আপনারা এই বাংলা ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না যদি না আপনারা কোরআন, হাদিসে ফিরে যান। ইসলামের কোন বিষয়ে হানাফি মাজহাবে যা আছে বা শাফি মাজহাবে কি আছে বা হাম্বলি মাজহাবে যা আছে বা বিন বায যা বলেছেন বা উতাইমিন কি বলেছেন বা আল বানী যা বলেছেন তাই যদি আপনার শেষ কথা হয় তাহলে আপনি ইসলাম কি, ইসলামের স্বাদ কি তা কোন দিন-ই পাবেন না আর সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠাও করতে পারবেন না। আবু হানিফা, শাফি, হাম্বলি, বিন যায, আলবানী, ইত্যাদি আলেমগণ হচ্ছেন আমাদের শিক্ষক। আমরা উনাদের কাছ থেকে কোরআন, হাদিস ব্যাখ্যা করা শিখব, কোনটি জাল হাদিস, সাহিহ, যইফ হাদিস ইত্যাদি জানব কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কি করতে হবে সেই ব্যাপারে আমরা কোরআন, হাদিস থেকেই সিদ্ধান্ত নিবো।

তাহলে, এখন আমাদেরকে কিছু জ্ঞানী লোকের সমন্বয়ে একটি শুরা কাউন্সিল বা কমিটি করতে হবে যার একজন নেতা থাকবে যার নেতৃত্বে ইসলামী শরিয়া আইনের সকল আইন কোরআন, হাদিস থেকে নতুন করে খুঁজে বের করে লিখতে হবে। মানুষের জন্য যত সহজ করে এবং যত নমনীয় করে আইন বাস্তবায়নের জন্য বের করা যাবে ততই ভালো যাতে মানুষ সহজে তা গ্রহন করে নেয়। যে ব্যাপারে ইসলামী ভূখণ্ডের শাসক বা খলিফা কোন ছাড় দিবেন না তা নিম্নরুপঃ

১) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ ছাড়া কোন আইনদাতা নেই, আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই।

২) সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

৩) মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর রসূল।

৪) ইসলামের নামে শিরক, কুফর করা যাবে না। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, ইত্যাদি রাষ্ট্র পরিচালনার সকল সিস্টেমকে বাতিল এবং হারাম হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

৫) অন্য ধর্মের লোকেরা যার যার ধর্ম পালন করবে। কিন্তু সরকার প্রধান হিসেবে মুসলিম শাসকের কাছে বায়াত দিতে হবে যে, তারা ইসলামী সরকার বিরোধী বা ইসলামী রাষ্ট্র বিরোধী কোন কাজ করবেন না। ইসলামের ফৌজদারি আইন তাদের জন্যও প্রযোজ্য হবে। তারা তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্র থেকে পাবে। তারা যদি জুলুমের স্বীকার হয় তাহলে তারা প্রধান বিচারপতির কাছে খলিফার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন। আপনারা হয়তো জানেন যে, ইসলামে বিচার বিভাগ, প্রশাসন থেকে আলাদা।
৬) আল্লাহ এবং তার রসূলের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না।
৭) আমলের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর চাহিদা মোতাবেক মুসলিম শাসক নবীর সুন্নাহের ভিতরে থেকে কিছু ছাড় দিতে পারবেন। যেমনঃ সাকিফের লোকদের থেকে আল্লাহ এর রসূল সাঃ জিহাদ এবং যাকাত না দেয়ার শর্তেও বায়াত বা অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। এক ব্যক্তি থেকে দিনে ২ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার শর্তে বায়াত নিয়েছিলেন।
৮) হাদ্দের আইন বাস্তবায়ন করবেন। এই ক্ষেত্রে নবীর সুন্নাহের ভিতরে থেকে শাস্তির সীমা কমানো যেতে পারে। যেমনঃ ৫ লাখ টাকার কম যদি কেউ চুরি করে তাহলে তার হাত কাঁটা হবে না। এই ক্ষেত্রে দেখতে হবে উক্ত ছাড় দেয়াতে ইসলামী সরকার অর্থনৈতিকভাবে এবং প্রতিরক্ষার দিক থেকে শক্তিশালী হচ্ছে কি না। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সেই সিদ্ধান্ত কাজে লাগছে কি না।

আমি ইতিমধ্যেই ইসলামে পর্দার বিধান, ছেলেমেয়েদের ফ্রি মিক্সিং, যিনাহ ব্যভিচারের শাস্তি, ধর্ষণের শাস্তি কোরআন হাদিস থেকে উল্লেখ করেছি। সেই সাথে সাথে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বার্থে চুরির শাস্তি হাত কাঁটার জন্য যে চুরিকৃত সম্পদের পরিমাণ বাড়ানো যাবে তাও উল্লেখ করেছি। এখন আমরা ইসলামে ধর্মান্তরের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবঃ

ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার শাস্তি কি?

প্রথমে অন্ধের মত জেনে নেই বিখ্যাত ৪ মাজহাবে ইসলাম ত্যাগকারীর ব্যাপারে কি বলা হয়েছে?
হানাফি (মাজহাব) ফিকহঃ যদি কেউ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে। এক্ষেত্রে তাকে তওবা করে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হতে পারে আবার না-ও দেয়া হতে পারে। যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারী পুরুষ হয় তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে আর নারী হলে তাকে বন্দি করে প্রতি ৩ দিন পরপর পিটাতে হবে যাতে সে তওবা করে ইসলামে ফিরে আসে। হানাফি ফিকহে হত্যার শাস্তির জন্য একজন ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারীর মৃত্যুদণ্ড হবার জন্য ধর্ম ত্যাগের সাথে সাথে ডাকাতি বা চুরির দায়েও

অভিযুক্ত হতে হবে। কিন্তু যদি শুধু ধর্ম ত্যাগ করে তাহলে? এই ক্ষেত্রে বর্তমান হানাফি আলেমদের মতামত হচ্ছে তাকে হত্যা করতে হবে।

শাফি (মাজহাব) ফিকহঃ ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারীকে তওবা করে ইসলামে ফিরে আসার জন্য ৩ দিন সময় দেয়া হবে, যদি ৩ দিনের মধ্যে সে ফিরে না আসে তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে।

মালিকি (মাজহাব) ফিকহঃ তওবা করে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার জন্য জন্য ১০ দিন সময় দেয়া হবে; যদি এই ১০ দিনে ফিরে না আসে তাহলে ধর্ম ত্যাগকারী পুরুষ হোক বা নারী হোক তাকে হত্যা করতে হবে।

হাম্বলি (মাজহাব) ফিকহঃ তওবা করার জন্য সময় দেয়া হতে পারে আবার নাও দেয়া হতে পারে। যে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে তাকে, পুরুষ বা নারী হোক, হত্যা করতে হবে।

এখন আমরা কোরআন হাদিস থেকে দেখব সঠিক নিয়মটা কি?

সে বলল, ''হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে দেখ, আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর তিনি তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে অনুগ্রহ প্রদান করে থাকেন যা তোমাদের দৃষ্টি থেকে গোপনে রাখা হয়েছে, এমতাবস্থায় তা গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি কি তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি যখন তোমরা তা অপছন্দ কর? (সূরা হুদঃ২৮)

"দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি কিংবা বাধ্যবাধকতা নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরেছে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"। (কোরআন সূরা বাকারা ২৫৬)

অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। (২১) তুমি তাদের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নও। (২২) তবে কেউ কুফুরি করলে এবং মুখ ফিরিয়ে নিলে (২৩) আল্লাহ তাকে দেবেন মহা শাস্তি (২৪) । (সূরা গাশিয়া ২২-২৪)

সূরা হুদঃ২৮; সূরা বাকারা ২৫৬; সূরা গাশিয়ায় ২২-২৪ নাম্বার আয়াতগুলোতে আল্লাহ এই কথাটাই বলছেন যে, দীন ইসলাম গ্রহন বা বর্জনের ব্যাপারে কোন জোর – জবরদস্তি নেই। নিম্নের আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, দীনের কোন অংশ গ্রহনের সাথে জোর জবরদস্তি নেই।

আর বলে দাও, 'সত্য এসেছে তোমাদের রব্বের নিকট হতে, কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করুক।……….। (সূরা কাহফঃ ২৯)

আর যদি তোমার রব চাইতেন, তবে যমীনের সকলেই ঈমান আনত। তবে কি তুমি মানুষকে বাধ্য করবে, যাতে তারা মুমিন হয় ? (সূরা ইউনুসঃ৯৯)

এখন সকল কিছু পরিষ্কার। আল্লাহ বলছেন যে, ইসলামের বিশ্বাস গ্রহন বা বর্জনের ব্যাপারে কারো উপর কোন জবরদস্তি নেই। অর্থাৎ কেউ যদি ইসলামের বিশ্বাসগুলো গ্রহন করে তো করবে আর যদি গ্রহন না করে তাহলে করবে না। যদি কেউ ইসলামের এই বিশ্বাসগুলো গ্রহন করার পর আবার ইসলামের বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করতে চায়? তাহলে, সে এটা করতে পারবে। এতে তাকে বাধা দেয়া হবে না।

"তোমাদের কী হল যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে (কী নীতি অবলম্বন করা হবে সে বিষয়ে) তোমরা দু' দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের এ কার্যকলাপের কারণে তাদেরকে উল্টা মুখে ফিরিয়ে দিয়েছেন (ইসলাম থেকে আবার কুফরের দিকে)। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তোমরা কি তাকে সুপথ দেখাতে চাও? বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কক্ষনো পথ খুঁজে পাবে না। (৮৮) তারা আকাঙ্ক্ষা করে যে, তারা নিজেরা যেমন কুফরী করেছে, তোমরাও তেমনি কুফরী কর, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। কাজেই তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত তারা আল্লাহর পথে হিজরত না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে গ্রেফতার কর এবং যেখানেই তাদেরকে পাও, হত্যা কর। তাদের মধ্য হতে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী গ্রহণ করো না। (৮৯) কিন্তু (সে সব মুনাফিক এ কথার মধ্যে শামিল নয়) যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। তেমনি (তারাও এর মধ্যে শামিল নয়) যারা তোমার কাছে আসে আর তারা ঝগড়া-বিবাদে উৎসাহী নয়, তারা না তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, না নিজের জাতির বিরুদ্ধে। আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন, তবে তাদেরকে তোমাদের উপর প্রবল করে দিতেন, সে অবস্থায় তারা নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। কাজেই তারা যদি তোমাদের হতে সরে থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে ও তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেননি। (৯০) তোমরা অচিরেই অন্য লোককে পাবে, যারা তোমাদের কাছে নিরাপত্তা চাইবে এবং নিরাপত্তা চাইবে তাদের কওমের কাছেও। যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে প্রলুব্ধ করা হয়, তারা সেখানে ফিরে যায়। সুতরাং যদি তারা তোমাদের থেকে সরে না যায় এবং তোমাদের কাছে সন্ধি প্রস্তাব উপস্থাপন না করে এবং নিজদের হাত গুটিয়ে না নেয়, তাহলে তাদেরকে পাকড়াও করবে এবং হত্যা করবে যেখানেই তাদের নাগাল পাবে। আর ওরাই তারা, যাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ক্ষমতা দিয়েছি।" (সূরা আন নিসা ৮৮-৯১)

আল্লাহ সূরা নিসার ৮৮-৯১ নাম্বার আয়াতে বলছেন এমন এক দল লোকের কথা যারা ইসলাম গ্রহনের পর পুনরায় ইসলাম থেকে ফিরে গেছে। আল্লাহ বলেন,”...। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে গ্রেফতার কর এবং যেখানেই তাদেরকে পাও, হত্যা কর……..."। কিন্তু আল্লাহ শর্ত দিয়েছেন যে, (এদের মধ্যে যারা) "যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। তেমনি (তাদেরকেও গ্রেফতার বা হত্যা করো না) যারা তোমার কাছে আসে আর তারা ঝগড়া-বিবাদে উৎসাহী নয়, তারা না তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, না নিজের জাতির বিরুদ্ধে"।

অর্থাৎ যারা ইসলামের বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করেছে কিন্তু তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বা ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় নি, লড়াই করতে না চাইবে বা ষড়যন্ত্র না করবে তারা ইসলামের বিশ্বাস ত্যাগ করার পরও তাদেরকে গ্রেফতার বা হত্যা করা যাবে না। আমার মতামতের পক্ষে প্রমানঃ

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ এক বেদুইন আল্লাহর রাসূলের কাছে ইসলামের জন্য আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিল এবং বেদুইন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নবী (সাঃ)-কে বলেছিল, “আমার বাইয়াত (অঙ্গীকার) বাতিল করুন। কিন্তু নবীজি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি (আবার) তাঁর কাছে এসে বললেন, "আমার অঙ্গীকার বাতিল করুন।" কিন্তু নবী প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর (বেদুইন) (মদিনা) চলে গেলেন। আল্লাহর রসূল সাঃ বললেন: "মদিনা হল একজোড়া বেল (চুল্লি) এর মতো: এটি তার অপবিত্রতা দূর করে এবং তার ভালকে উজ্জ্বল ও পরিষ্কার করে।" (সহীহ বুখারী খণ্ড ৯, বই ৮৯, হাদিস নম্বর ৩১৬)

বেদুইন ইসলাম গ্রহনের পর নবীর কাছে বায়াত দিয়েছিল পরে সে বায়াত বাতিল করার জন্য নবী সাঃ এর কাছে আসলে নবী সাঃ তাতে রাজি হননি। হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বেদুইন যখন মদিনা ছেড়ে চলে গেছে তখন তাকে কেউ বাধা দেয়নি। এর কারণ কি?

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত - যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল - শুধুমাত্র তিনটি কারণ ছাড়া বৈধভাবে প্রবাহিত করা যাবে না: যে ব্যক্তি বিয়ের পর ব্যভিচার করেছে, সেক্ষেত্রে তাকে পাথর ছুড়ে মারা হবে; যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হয়, সেক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা বা ক্রুশবিদ্ধ করা বা দেশ থেকে নির্বাসিত করতে হবে; অথবা যে হত্যা করে যার জন্য তাকে হত্যা করা হয়। (সুনানে আবু দাউদ ৪৩৫৩)

যে মুসলিম আল্লাহ এবং তার রসূলের সাঃ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হবে তাকে হত্যা বা ক্রুশবিদ্ধ বা দেশ থেকে নির্বাসিত করতে হবে। যখন কেউ আল্লাহ এবং তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হয় তখন সে আর মুসলিম থাকে না, কিন্তু উক্ত হাদিসে ইসলাম ত্যাগ করার কথা না বলে - বলা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রসূলের সাঃ বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ যে মুসলিম সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল, তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া তার প্রাণ হরণ করা বৈধ নয়ঃ বিবাহিত ব্যভিচারী, জীবনের জন্য জীবন, এবং জীবনব্যবস্থা (ইসলাম) ত্যাগকারী ও সম্প্রদায় ত্যাগকারী। (সাহিহ মুসলিম বই ১৬ হাদিস ৪১৫২)

সাহিহ মুসলিম বই ১৬ হাদিস ৪১৫২ হাদিসে বলা হয়েছে যে, যে মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করবে এবং সম্প্রদায় ত্যাগ করবে তাকে হত্যা করা হবে। এখন কোন মুসলিম যদি ইসলাম ত্যাগ করে কিন্তু সম্প্রদায় ত্যাগ না করে তাহলে? তাহলে কি তাকে হত্যা করা হবে? না, হত্যা করা হবে না কারণ তাকে হত্যা করতে হলে শর্ত দুইটি। যথাঃ ১) তাকে ইসলাম ত্যাগ করতে হবে ২) তাকে সম্প্রদায় ত্যাগ করতে হবে।

এখন তাকে ইসলাম ত্যাগ বলতে কি বুঝা যাচ্ছে? সে ইসলামের বিশ্বাস ত্যাগ করেছে আর সম্প্রদায় ত্যাগ বলতে বুঝা যাচ্ছে সে ইসলামের জীবন বিধান অর্থাৎ অমুসলিমরা ইসলামের যে অংশটুকু স্বীকার করে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে সেই অংশটুকুও অস্বীকার করে অর্থাৎ ইসলামের ফৌজদারি আইনকেও সে অস্বীকার করে। অর্থাৎ একজন মুসলিম যদি ইসলামের বিশ্বাসকে ত্যাগ করে এবং ইসলামকে জীবন বিধানকেও অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। এর পিছনে যদি যৌক্তিক কারণ খুজি তাহলে বুঝা যাবে যে কেন ইসলামের শুধুমাত্র বিশ্বাসগুলোকে (ঈমানের ৭ টি বিষয়) ত্যাগ করলে একজনকে হত্যা করা হবে না কিন্তু ইসলামের বিশ্বাসসহ জীবন বিধানকে অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করা হবে।

ইসলামী জীবন বিধান হচ্ছে আল্লাহ এর দেয়া জীবন বিধান যা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য অনুসরণ করা ফরয। এই জীবন বিধানে বলা আছে, একজন অমুসলিম ইসলামের কতটুকু মানবে? একজন মুসলিম কতটুকু মানবে? আর একজন মুসলিম যে বিশ্বাসী হতে চায় তাকে কি কি করতে হবে বা তাকে কি কি আইন মানতে হবে?

যদি কেউ ইসলামের জীবন বিধানকে অস্বীকার করে তাহলে সে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াল আর ইসলামী রাষ্ট্র হচ্ছে এমন রাষ্ট্র যে রাষ্ট্র আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা বলে স্বীকার করে, আল্লাহকে রব

বলে স্বীকার করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি আনুগত্যকে অস্বীকার করে, মুহাম্মাদ সাঃ কে আল্লাহ এর গোলাম এবং রসূল বলে স্বীকার করে। এখন কেউ যদি ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে অস্বীকার করে সম্প্রদায়কে (***) ত্যাগ করে তাহলে সে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই দাঁড়াল আর ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে সেটা আল্লাহ এবং রসূলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো হয় কারণ ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা বলে স্বীকার করে,আল্লাহ এর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে, মুহাম্মাদ (সাঃ) কে আল্লাহ এর রসূল বলে স্বীকার করে। কোরআনে যারা আল্লাহ এবং তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাদের কি শাস্তির কথা বলা আছে?

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর যমীনে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে বেড়ায় তাদের শাস্তি হল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এ হল তাদের জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, আর তাদের জন্য আখেরাতে রয়েছে মহাশাস্তি"। (সূরা আল মায়েদাঃ ৩৩)

এখন সূরা আল মায়েদার ৩৩ নাম্বার আয়াতের সাথে সুনানে আবু দাউদ ৪৩৫৩ হাদিসে উল্লেখিত উক্ত মুসলিমের শাস্তির কথা মিলিয়ে দেখুন।

(***) সাহিহ মুসলিম বই ১৬ হাদিস ৪১৫২ হাদিসে সম্প্রদায় ত্যাগকারী বলতে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্য লোকেরা অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, ইত্যাদি সবাইকে পরিত্যাগ করাকে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ সে এই জনগোষ্ঠীর নেতাকেও ত্যাগ করেছে বা অস্বীকার করেছে অর্থাৎ উক্ত দেশের সরকার প্রধান বা খলিফাকেও অস্বীকার করে।

এখন বুঝা যাচ্ছে বেদুইন যখন মুহাম্মাদ সাঃ এর কাছে তার বায়াত বাতিল করতে এসেছিল তখন তাকে নবী সাঃ কেন হত্যা করেন নি। কারণ সে ইসলামী রাষ্ট্রকে এবং এর সরকার প্রধানকে অস্বীকার করেনি। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েই সেই বেদুইন এসেছিল তার বায়াত বা অঙ্গীকার বাতিল করতে অর্থাৎ নবীর সাঃ কাছে অনুমতি নিতে। সে যে ইসলামী রাষ্ট্রের (সম্প্রদায়ের) প্রধান নবীর কাছে অনুমতি নিতে এসেছিল – এটাই প্রমাণ করে যে, সেই বেদুইনের ঈমান নষ্ট হয়ে গেলেও - সেই বেদুইন ইসলামী রাষ্ট্র (সম্প্রদায়) ত্যাগকারী ছিল না।

আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন:

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে মুসলমান স্বীকার করে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদতের অধিকার নেই এবং আমি তাঁর রসূল, তার রক্ত প্রবাহিত করা যাবে না তিনটি

ক্ষেত্রে ব্যতীত: হত্যার কিসাসে, যে বিবাহিত ব্যক্তি অবৈধ যৌনসম্পর্ক করে এবং যে ইসলাম থেকে ফিরে যায় (মুরতাদ) এবং মুসলমানদের ত্যাগ করে। (সহীহ আল-বুখারী ৬৮৭৮)
একজন অমুসলিম যে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে সে মুসলিমদের ত্যাগকারী নয়। সে মুসলিমদের সাথে একই রাষ্ট্রে (সম্প্রদায়ে) বসবাস করে। ইসলামের ফৌজদারি আইন সেও মুসলিমদের মতই মেনে নিয়ে বসবাস করে। সে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানকে রাষ্ট্র প্রধান (সম্প্রদায় প্রধান) হিসেবে মেনে নিয়েই বসবাস করে।

তাহলে, যে ব্যক্তি ইসলামের ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করতে চাইবে যেমন মুসলিম থেকে সে হিন্দু বা খ্রিস্টান ধর্ম বিশ্বাস সে গ্রহন করতে চায় কিন্তু ইসলামের ফৌজদারি আইন সে মানবে এবং সম্প্রদায়ের নেতাকে (খলিফাকে) সরকার প্রধান হিসেবে সে অস্বীকার করবে না তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না। কিন্তু কোন মুসলিম যদি ইসলামের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সাথে ইসলামের ফৌজদারি আইনকেও অস্বীকার করে অর্থাৎ ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে অস্বীকার করে অর্থাৎ খলিফাকে অস্বীকার করে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রকে অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে কারণ ইসলামী রাষ্ট্রকে অস্বীকার করার মাধ্যমে সে আল্লাহ এবং তার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার মত অপরাধ করেছে কারণ ইসলামী সম্প্রদায় বা রাষ্ট্র আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা এবং রব হিসেবে স্বীকার করে, মুহাম্মাদ সাঃ কে আল্লাহ এর রসূল বলে স্বীকার করে।

"…………..যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে গ্রেফতার কর এবং যেখানেই তাদেরকে পাও, হত্যা কর। তাদের মধ্য হতে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী গ্রহণ করো না। (৮৯) কিন্তু (সে সব মুনাফিক এ কথার মধ্যে শামিল নয়) যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। তেমনি (তারাও এর মধ্যে শামিল নয়) যারা তোমার কাছে আসে আর তারা ঝগড়া-বিবাদে উৎসাহী নয়, তারা না তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, না নিজের জাতির বিরুদ্ধে।…………..”(৯০)
যারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কিন্তু তারা যদি মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির সাথে মিলিত হয় তাহলে সে ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বে অস্বীকার করে না কারণ সে এমন জাতির সাথে মিলিত হয়েছে যারা ইসলামী সম্প্রদায়কে এবং এর নেতাকে মেনে নিয়েই চুক্তি করেছে। আবার এমন কিছু লোক ইসলামের ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করেছে যারা ইসলামী সম্প্রদায়ের বা রাষ্ট্রের প্রধানের কাছে আসে

যারা ইসলামী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বা ইসলামী সরকারকে উৎখাতের কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নয় তাদেরকেও গ্রেফতার বা হত্যা করা যাবে না।

বুঝা গেলো, যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের বিশ্বাসগুলো অর্থাৎ ঈমান পরিত্যাগ করে খ্রিষ্টান হতে চায় বা হিন্দু হতে চায় কিন্তু সে ইসলামী রাষ্ট্র (সম্প্রদায়) ত্যাগ করেনি অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রে অন্য হিন্দু বা খ্রিষ্টানরা যেভাবে ইসলামের ফৌজদারি আইন মেনে থাকে এবং মুসলিম খলিফাকে সরকার প্রধান হিসেবে মেনে নিয়ে থাকে সে সেভাবেই থাকতে চায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না।

আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন যে, উরায়না (গোত্রের) কিছু লোক মদিনায় আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর কাছে এসেছিল, কিন্তু তারা সেখানকার জলবায়ুকে অস্বস্তিকর মনে করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে বললেনঃ তোমরা চাইলে সাদাকার উটের কাছে গিয়ে তাদের দুধ ও প্রস্রাব পান করতে পারো। তারা তাই করেছে এবং সব ঠিক ছিল। তখন তারা রাখালদের উপর পতিত হয় এবং তাদের হত্যা করে এবং ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায় এবং নবী (সাঃ)-এর উট তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ খবর আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে পৌছালে তিনি (লোকদের) তাদের পিছনে পাঠালেন এবং তাদেরকে (ধরে নিয়ে এসে) তাঁর (মুহাম্মাদ সাঃ) কাছে হস্তান্তর করা হলো। তিনি (সাঃ) তাদের হাত ও পা কেটে ফেললেন এবং তাদের চোখ বের করে পাথরের মাটিতে নিক্ষেপ করলেন যতক্ষণ না তারা মারা যায়। (সহীহ মুসলিম ১৬৭১ ক)

এই হাদিসে আল্লাহ এর রসূল সাঃ উরাইনা গোত্রের ঐ লোকদের শাস্তি দিয়েছিলেন প্রতারণা, হত্যা, ডাকাতি, ইসলাম ত্যাগ এবং ইসলামী সম্প্রদায়কে ত্যাগ করার কারণে। এই হাদিস থেকে শুধুমাত্র ইসলামের বিশ্বাসগুলো ত্যাগ করার কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে - এই কথা বলা যাবে না কারণ উরাইনার ঐ লোকেরা সম্প্রদায় ত্যাগ করেছিল, হত্যা করেছিল, ধোঁকা দিয়েছিল, ডাকাতি করেছিল।

ইকরিমা থেকে বর্ণিত:

আলী কিছু লোককে পুড়িয়ে ফেলেন এবং এই খবর ইবনে আব্বাসের কাছে পৌঁছে, তিনি বলেন, "আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম তবে আমি তাদের পুড়িয়ে দিতাম না, যেহেতু নবী (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর শাস্তি দিয়ে (কাউকে) শাস্তি দিও না।' নিঃসন্দেহে, আমি তাদের হত্যা করতাম, কেননা নবী

(সাঃ) বলেছেন, 'কেউ (একজন মুসলিম) তার ধর্ম বর্জন করলে তাকে হত্যা কর। (সহীহ আল-বুখারী ৩০১৭; অনুরূপ হাদিস সাহিহ বুখারী ৬৯২২)

আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে আবার ইহুদী ধর্মে ফিরে গেল। মুআয ইবনে জাবাল এসে আবু মুসার সাথে লোকটিকে দেখতে পেলেন। মুআয (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এর (মানুষের) দোষ কি? আবু মুসা উত্তরে বললেন, "তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তারপর ইহুদী ধর্মে ফিরে আসেন।" মুআয (রাঃ) বললেন, আমি বসব না যতক্ষণ না তুমি তাকে হত্যা কর (যেমনটা) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফয়সালা। (সহীহ আল-বুখারী ৭১৫৭; অনুরূপ হাদিস সহীহ বুখারী ভলিউম ৯, বুক ৮৪, হাদিস নম্বর ৫৮)

সহীহ আল-বুখারী ৩০১৭ এবং সহীহ আল-বুখারী ৭১৫৭ হাদিস দু'টিতে সাহাবীরা কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারীদের হত্যা করেছিলেন তা বুঝা যাচ্ছে না। ঐ লোকেরা কি ইসলাম ত্যাগ করে ইসলামের ও মুসলিমদের শত্রুদের সাথে যোগ দেয়ার চেষ্টা করেছিল? না অন্য কিছু ? এই রূপ অবস্থায় এই দুটি হাদিস (সহীহ আল-বুখারী ৩০১৭, সহীহ আল-বুখারী ৭১৫৭) থেকে কোন নিয়ম বা আইন বের করা যাচ্ছে না।

তাহলে আমরা বাংলা অঞ্চলে যে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি তার জন্য ইসলাম ধর্ম ত্যাগকারীর কি শাস্তি থাকবে?
যদি সেই ব্যক্তি ইসলামের ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হতে চায় তাহলে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার – এজন্য তাকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না। সে একজন অমুসলিম হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করবে এবং ইসলামের ফৌজদারি আইন মেনে চলবে। আশা করা যায় যে, এতে মুসলিম শাসকের কোন গুনাহ হবে না। এতে শর্ত আছে যে, উক্ত ব্যক্তি বাংলা অঞ্চলের ইসলামী শরিয়া আইন-ভুক্ত সম্প্রদায়ের শত্রু কোন রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর পক্ষে গোয়েন্দাগিরি বা ষড়যন্ত্র করতে পারবে না এবং সম্প্রদায় অর্থাৎ ইসলামী শরিয়া আইন মেনে যে সকল মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান ইত্যাদি থাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা ষড়যন্ত্র করতে পারবে না। আমার মতামতের পক্ষে প্রমাণ কোরআনের আয়াত এবং হাদিসঃ

"আর বলে দাও, 'সত্য এসেছে তোমাদের রব্বের নিকট হতে, কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান (বিশ্বাস) আনুক আর যার ইচ্ছে অবিশ্বাস করুক।……….।" (সূরা কাহফঃ ২৯)
"আর যদি তোমার রব চাইতেন, তবে যমীনের সকলেই ঈমান (বিশ্বাস) আনত। তবে কি তুমি মানুষকে বাধ্য করবে, যাতে তারা মুমিন (বিশ্বাসী) হয়?" (সূরা ইউনুসঃ৯৯)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ যে মুসলিম সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল, তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া তার প্রাণ হরণ করা বৈধ নয়ঃ বিবাহিত ব্যভিচারী, জীবনের জন্য জীবন, এবং জীবনব্যবস্থা (ইসলাম) ত্যাগকারী ও সম্প্রদায় ত্যাগকারী। (সাহিহ মুসলিম বই ১৬ হাদিস ৪১৫২)
*** বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি হিসেবে যেহেতু হত্যার কথা বলা হচ্ছে তার মানে এই হাদিসগুলো সূরা নূর এবং সূরা নিসা নাযিলের আগের হাদিস।

আমি এই বইটিকে ২০০ পৃষ্ঠার বেশি করতে পারব না তাহলে পাঠক বইটি পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে কারণ এখন বড় বই পড়ার মত সময় মানুষের নেই। তাই, আমার পক্ষে ইসলামী শরিয়ার সকল আইন কানুন কোরআন, হাদিস খুঁজে বের করে এখানে লিখা সম্ভব না। তাহলে বাংলা ভূখণ্ডে যারা ইসলাম শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন - যারা গণতন্ত্রকে শিরক বলেন, পীরতন্ত্রকে অস্বীকার করেন, রাজতন্ত্রকে অস্বীকার করেন তাদের করনীয় কি? আল্লাহ চাইলে, যদি জামাতে ইসলামী, NCP গণতন্ত্র বাদ দিয়ে নিম্ন লিখিত উপায়ে এই ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কাজ করে তাহলে তারা সফল হবে বলে আশা করি।

আমাদের করনীয়

আমাদেরকে নতুন করে কোরআন এবং হাদিস নিয়ে বসতে হবে। কোরআন হাদিস থেকে কত সহজ করে ইসলামী শরিয়ার প্রতিটি আইন মানুষের জন্য বের করা আনা যায় তা খুঁজতে হবে। তারপর সেই আইনগুলো বই আকারে প্রকাশ করতে হবে। একটি বইয়ে না হলে ৪-৫ টি খণ্ড করতে হবে।

প্রতিটি আইন যে লিখবেন তার জন্য সেই সম্পর্কিত সকল কোরআনের আয়াত এবং সকল হাদিস রেফারেন্সসহ লিখবেন। রেফারেন্স ছাড়া লিখলে মানুষ আপনার কথা বিশ্বাস করবে না। মানুষ যেন আপনার প্রতিটি কথা কোরআন, হাদিস থেকে যাচাই করতে পারে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোরআন,

হাদিস ছাড়া লিখলে অশিক্ষিত মানুষ আপনার কথা গ্রহন করতে পারে কিন্তু স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা লোকেরা আপনার কথা বিশ্বাস করবে না। আর ইসলামী শরিয়া প্রতিষ্ঠায় আমাদের এনালাইসিসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দল যাকে আমরা "গুরুত্বপূর্ণ দল বা শ্রেণী" বলে এই বইয়ে চিহ্নিত করেছি তারা তো গ্রহন করবেই না।

আমরা কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবো না। আবু হানিফা, হাম্বলি, শাফি, বিন বায, উতাইমিন, ইবনে হাযর আসকালানী, আজ জুহরি, মওদুদি, গোলাম আযম কাউকেই না। আমাদের শরিয়া আইন আসবে কোরআন এবং হাদিস থেকে। বাস! এখানেই শেষ। কোন ইমাম, আলেম, মুফতি, মুহাদ্দিস, কোরআন হাদিস ব্যাখ্যা করে কি বলেছেন তা আমাদের দরকার নাই। এই বই যারা পড়েছেন তারা জানেন আমি নারীদের জোর করে বা শাস্তি দিয়ে বা জরিমানা করে হিজাব পড়ানোর বিরোধিতা করেছি কারণ এই রূপ কোন আইন আল্লাহ এর রসূল সাঃ বাস্তবায়ন করেন নি বা করতে বলেন নি। 'আলেমগণ' কোরআন ব্যাখ্যা করে এই গুলিকে শরিয়া বলে ইসলামে ঢুকিয়েছে। তাদের এই ধরণের ব্যাখ্যা ভুল এবং পরিত্যাজ্য।

এখন আসব আমলের কথায়। শরিয়া আইনে বিবাহিত ধর্ষকের শাস্তি পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড আছে কিন্তু এই দেশের মানুষ যদি খলিফার কাছে বা মুসলিম শাসকের কাছে এই বলে বায়াত দেয় যে আমরা বিবাহিত ধর্ষকের শাস্তি পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি চাই তবে তাকে ফাঁশি বা শিরচ্ছেদ করা যেতে পারে। তাহলে, মুসলিম শাসক বলবেন, হাদিসে অর্থাৎ শরিয়া আইনে পাথর নিক্ষেপে হত্যার কথাই বলা আছে কিন্তু তোমরা যদি ফাঁসি চাও তাহলে তা না দিয়ে শিরচ্ছেদ দেয়া যেতে পারে কারণ ফাঁসি বলে কোন শাস্তি ইসলামে নাই তবে শিরচ্ছেদ আছে। কিন্তু এজন্য তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ এর কাছে জবাবদিহি করতে হবে যে, কেন পাথর নিক্ষেপে হত্যা না করে শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল। যদি মুসলিমরা (জনগণ) বলে যে, চোরের হাত কাঁটার আইন না করে জেল দিবেন তাহলে বলা হবে যে, এটা করা সম্ভব নয় কারণ কোরআনে হাত কাটার আইন আছে, তবে তোমরা যদি এই শর্তে বায়াত দাও যে, চোরের হাত না কেটে আঙ্গুল কাঁটা হবে বা হাত কাটার জন্য চুরিকৃত অর্থের পরিমাণ কমপক্ষে ৫ লাখ টাকা হতে হবে - এই শর্তে বায়াত বা অঙ্গীকার নেয়া যাবে। এভাবে প্রতিটি বিষয়ে মুসলিম শাসক শাস্তি কমিয়ে বা আইন সহজ করে এই অঞ্চলের মুসলিমদের থেকে বায়াত নিতে পারবেন - আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) সাকিফের লোকদের বায়াত নেয়াকে অনুসরণ করে যারা যাকাত না দেয়া এবং জিহাদ না করার শর্তে বায়াত দিয়েছিল। একজন লোকের থেকে আল্লাহ

এর রসূল সাঃ দিনে ২ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার শর্তেও বায়াত নিয়েছিলেন। বুঝা গেলো, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক চাইলে আমল কমিয়ে বা সহজ করে বায়াত নিতে পারবেন – এটা ইসলামী শরিয়া আইন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার জন্য করা হচ্ছে। এতে উক্ত রাষ্ট্রকে কি ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে? না, বলা যাবে না। এরা শুধুমাত্র রাষ্ট্রে বা সমাজে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠায় অনেক ধাপ এগিয়ে গেল। অন্তত এতটুকু বলা যাবে যে, এই সমাজের মানুষ বা রাষ্ট্রের লোকেরা আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা বলে স্বীকার করে নিয়েছে। সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ – এই কথা মেনে নিয়েছে। আমলের ক্ষেত্রে, খলিফার অনুমতি নিয়ে এরা কিছু ক্ষেত্রে কিছু ছাড় নিয়েছে। **যদি খুব বেশি ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া না লাগে তাহলে, উক্ত রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যাবে।**

এভাবে এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে যাবে যদিও আমলের দিক থেকে এরা শতভাগ আল্লাহ এর আইন মানছে না। কিন্তু এরা শিরক থেকে বেচে যাবে কারণ এই ভূখণ্ডের মানুষ বা মুসলিমরা বিশ্বাস এবং স্বীকার করে নিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন আইনদাতা নেই। আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই। মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর রসূল (সাঃ)। সুতরাং, এদের জান্নাতে যাবার সম্ভাবনা এখনকার চেয়ে অনেক বাড়বে। কারণ এখন তো এরা আল্লাহকে আইনদাতা বলে মানে না। এরা মানুষকে আইনদাতা বলে মানে যা বড় শিরক। ফলে এদের ঈমান-ই নষ্ট হয়ে গেছে।

আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছিলেন যে, সাকিফের লোকেরা ইসলাম গ্রহনের পর যাকাত দিবে এবং জিহাদও করবে। এই অঞ্চলের লোকদের জন্যও এই কথাটা প্রযোজ্য হবে।

তাহলে সকল আইন কোরআন, হাদিসের উদ্‌ধৃতি রেফারেন্সসহ দিয়ে বই প্রকাশের পর তা ইউটিউব, ফেসবুকে ব্যাপক প্রচার করা হবে এবং মানুষের মতামত চাওয়া হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম, অমুসলিম সবার মতামত নিয়ে কোরআন, হাদিস থেকে আইনগুলো পুনরায় সংশোধন বা আরও সহজ করতে হবে যদি তা কোরআন হাদিস মোতাবেক করা যায়। ২-১ বছর পর মানুষের অংশগ্রহনে শরিয়ার কি কি আইন কিভাবে বাংলা অঞ্চলে কায়েম করা হবে -তা নিয়ে একটি আইনের বই পাওয়া যাবে যা হয়তো এক খণ্ডে হবে না কারণ একটি বিষয়ে কোরআনের সকল আয়াত এবং সকল হাদিস লিখে তারপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লিখে আইন বের করতে করতে অনেক পৃষ্ঠা লেগে যাবে, তাই ধরে নেয়া যায় বইটি ৩০০ পৃষ্ঠা করে ৬-৭ টি খণ্ডে প্রকাশিত হতে পারে (*)। বড় ব্যাপার হচ্ছে, মানুষ শরিয়া আইন সম্পর্কে জানতে পারবে। শরিয়া আইন সম্পর্কে তাদের ভুল এবং ভয় কেটে যাবে। এভাবে ২-৩ বছর চলার পর

যারা ইসলামী শরিয়া আইন চায় তাদেরকে নিয়ে একজন নেতার নেতৃত্বে মিছিলের ডাক দিতে হবে, দেশে ইসলামী শরিয়া আইনের পক্ষে গণজোয়ার আনতে হবে।

(*) অনেকের হয়তো ৬-৭ খণ্ড কেনার সামর্থ্য নেই বা এত পড়ার ইচ্ছাও নেই, তাই প্রতিটি টপিকে ছোট ছোট ২০-২৫ পৃষ্ঠার পুস্তিকা বের করা যেতে পারে যাতে কেউ যদি চুরির আইন বা যিনাহের আইন নিয়ে জানতে চায় তাহলে সে যেন অল্প দামে পুস্তিকাটি কিনে পড়তে পারে। তারপর সে উক্ত ব্যাপারে তার মতামত ফেসবুকে বা ইউটিউবে বা email এর মাধ্যমে দিতে পারবে। ফেসবুকে দেখা যাবে যে কোন কোন আইনের ব্যাপারে মানুষ বেশি আপত্তি করছে এবং তারা কি চায়? তারপর সেই সকল আইন নিয়ে পুনরায় রিভিউ করতে হবে।

এখন এই কাজটি কে করবে? কোরআন, হাদিস থেকে খুঁজে বের করে আইন লিখার কাজটির জন্য একজন জ্ঞানী, বিচক্ষণ, নমনীয় মুসলিমকে নেতা করে তার অধীনে জ্ঞানী মুহাদ্দিস, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের কোন বিষয়ে রিসার্চ করেছেন বা পিএইচডি করেছেন এমন অধ্যাপক,ইত্যাদি জ্ঞানী ব্যক্তিদের নেয়া যেতে পারে। দেশে থাকা বিভিন্ন মুসলিমদের দল যেমনঃ জামাতে ইসলামী থেকে প্রতিনিধি নেয়া যেতে পারে আহলে হাদিসদের থেকেও প্রতিনিধি নেয়া যেতে পারে যদি তারা রাজি হয়। আমি এই বইয়ে কয়েকটি বিষয়ে শরিয়ার বিশুদ্ধ ও অকাট্য উৎস কোরআন এবং হাদিস থেকে আইন বের করেছি। এভাবেই আইনগুলো বের করতে হবে। কোরআন এবং হাদিস থেকে। অমুক আলেম, ইমাম বা মুফতি এই কথা বলেছে তাই এটাই আইন – এই রকম কথা চলবে না। আয যুহরি বা ইবনে হাজর আসকালানি এই কথা বলেছেন – তাই এটাই আইন – এই রকম কোন কথা চলবে না। কোরআন হাদিসে যা আছে তাই। এর বাহিরে এক চুলও যাওয়া যাবে না। কোন রকম বাড়াবাড়ি করা যাবে না। যত সহজ আইন করা যায় - তত সহজ করতে হবে যাতে ইসলামী শরিয়া আইন গ্রহন করা মানুষের জন্য সহজ হয়। এ প্রসঙ্গে তো কিছু হাদিস এই বইয়ে উল্লেখ করাই হয়েছে। বর্তমানে, মানুষের সম্মতি নিয়েই এই ভূখণ্ডে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে, কোন রকম জোর জবরদস্তি বা ভয় দেখিয়ে নয়।

সম্পূরক অংশ

আপনারা কি একটি ব্যাপারে খেয়াল করেছেন, আমরা এত আলোচনা পড়লাম কিন্তু আমরা কি এখনো মানুষকে নামাজ পড়তে বলেছি? মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ কে দেয়া নবীর নির্দেশ এবং শর্ত মোতাবেক এখনো আমরা মানুষকে এই দাওয়াত-ই দিচ্ছি যে, "আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই,

মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর প্রেরিত দূত"। বাংলা অঞ্চলের মুসলিম সমাজের ৯০% মুসলিম এখনো এই কথা জানে না আর জানলেও মানে না। তাই, মুয়াজ বিন জাবালকে (রাঃ) নবীর সাঃ দেয়া শর্ত মোতাবেক এখনো আমরা মানুষকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথা বলতে পারছি না কারণ নবী শর্ত দিয়েছেন যে, "**যদি তারা** তোমার এই কথা মেনে নেয় যে "“আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য পাবার অধিকার নেই, মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহ এর প্রেরিত দূত" **তাহলে তাদেরকে** পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথা বলবে"। এখনো আমাদের দেশের ৯০% মুসলিম আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষের আনুগত্য করছে, মানুষের দেয়া আইন কানুন মানছে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষকে আইনদাতা মানছে, আল্লাহ এর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করছে - সুতরাং নবীর সাঃ দেয়া শর্ত মোতাবেক আমাদের দেশের মানুষকে এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দাওয়াত দেয়ার সুযোগ নেই। যাকাত, রোজা, হাজ্জ, পর্দা (হিজাব) তো বহু পরের বিষয়। এখন নবীর শর্ত না মেনে যারা গনতন্ত্রপন্থী, পীরপন্থী লোকদের নামাজের দাওয়াত, হিজাবের দাওয়াত, ইত্যাদির দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কি করবেন?

আমাদের এখন উচিত হচ্ছে প্রতিটি ওয়াজে, জুম্মার খুতবায় আল্লাহ একমাত্র আইনদাতা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আইন মানা হারাম, আল্লাহ ছাড়া কারো আনুগত্য করলে শিরক হয়, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সার্বভৌমত্বের মালিক বললে শিরক হবে, ঈমান নষ্ট হবে, কাফির হয়ে যেতে হবে --- এই কথাগুলো প্রচার করা। ইসলামী শরিয়া আইন কেন দরকার, ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা না করলে কি সমস্যা? ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করতে হবে। এগুলো কিভাবে আলোচনা করবেন তার জন্য একটু পড়ুনঃ

১) এক ওয়াজে বা একদিন জুম্মার বয়ানে আলোচনা করবেনঃ

“……..কাজেই মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, আর আমার আয়াতকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির।" (সূরা মায়েদাঃ ৪৪)

আল্লাহ বলছেন, যারা আল্লাহ এর নাযিল করা আইন দিয়ে অর্থাৎ কোরআনের আইন দিয়ে বিচার করে না তারা কাফির। তাহলে, আমরা যে মানুষকে ভোট দিয়ে আইনদাতা নিযুক্ত করি আর তারা সংসদে বসে আইন দেয়, আমরা আবার তাদের আইন মানি - তাহলে আমরা কি কাফির হব না ? আমরা তো ঐ সকল বিচারকের আগে কাফির হব যারা আল্লাহ এর আইন বাদ দিয়ে মানুষের দেয়া আইন দিয়ে

বিচার করে, রায় দেয়। তাহলে এখন কি করবেন? গণতন্ত্র বাদ দেন, ভোট দেয়া বাদ দেন। আল্লাহকে একমাত্র আইনদাতা এই কথা প্রচার করুন। বাড়িতে গিয়ে আপনার স্ত্রী, সন্তানদের, বন্ধু -বান্ধবদের , অফিসের সহকর্মীদের এই কথাগুলো বলুন। এবং তাদেরকেও বলুন অন্যদের বলতে। এভাবে ইমাম সাহেব বা আলেম সাহেব মুসল্লিদের জুম্মার বয়ানে বা ওয়াজে বলতে পারেন, আলোচনা করতে পারেন।

২) আরেকদিন ওয়াজে বা জুম্মার বয়ানে বলতে পারেনঃ

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়"। (সূরা নিসাঃ৬৫)

আল্লাহ বলছেন , হে নবী যারা আপনাকে তাদের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত না করে এবং আপনি যে রায় দেন তা অন্তর থেকে মেনে না নেয় তারা মুমিন (বিশ্বাসী) নয়। এখন আপনি কিভাবে নবীকে বিচারক হিসেবে মেনে নিবেন ? যদি আপনি নবীর সুন্নাহ মোতাবেক বিচার করে এমন কাউকে বিচারক হিসেবে নিযুক্ত না করেন এবং তার সুন্নাহ মোতাবেক করা বিচারকে অন্তর থেকে মেনে না নেন তাহলে আপনি মুমিন না, বিশ্বাসী না। জান্নাত হচ্ছে মুমিনদের জন্য, বিশ্বাসীদের জন্য। তাহলে নবীর সুন্নাহ মোতাবেক যারা বিচার করে না অর্থাৎ ইসলামী শরিয়া আইন মোতাবেক যারা বিচার করে না তাদের কাছে বিচার চাইতে গেলে তো প্রমান হয় যে, আপনি মুমিন না, বিশ্বাসী না। তাহলে বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় আপনি কারো নামে মামলা করলে তাতে আপনি মুমিন নন বলে প্রমাণিত হবেন। বুঝা গেলো, যারা আল্লাহ এর দেয়া আইন দিয়ে বিচার করে না - তাদের কাছে বিচার চাইতে যাওয়াও হারাম। তাহলে উপায় কি? উপায় হচ্ছে, আল্লাহ একমাত্র আইনদাতা। গনতন্ত্র শিরক – এই কথা প্রচার করুন। এখন বুঝতে পারছেন তো কেন ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

*** যদি কেউ আপনার নামে বর্তমানে - মানুষের দেয়া আইন দিয়ে পরিচালিত কোর্টে - মামলা দেয় তাহলে আপনি নিজেকে তাদের আইনে আপনি দোষী নন সেটা প্রমাণে আইনজীবী নিযুক্ত করতে পারবেন এবং নিজেকে তাদের আইনে আপনি নির্দোষ এটা প্রমাণ করতে পারবেন। এতে গুনাহ হবে না কারণ আপনি তাদের আইন মেনে নিচ্ছেন না বরং আপনি তাদেরকে বুঝাচ্ছেন যে, তাদের আইন দিয়ে তারা আপনাকে শাস্তি দিতে পারে না কারণ তাদের কোন আইন আপনি ভাঙ্গেন নি।

*** যদি বাংলাদেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র থাকত তাহলে আমরা যারা শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রচার করি, গণতন্ত্রের সমালোচনা করি - তাদেরকে গ্রেফতার করা হত না, জেল দেয়া হত না, মামলা করা হত না। কারণ, আমি আমার বিশ্বাস প্রচার করছি, আপনি আপনার বিশ্বাস প্রচার করুন। আপনার কাছে গনতন্ত্র ভালো লাগলে আপনি গণতন্ত্র প্রচার করুন। আমার কাছে ইসলাম ভালো লাগে, আমি ইসলাম প্রচার করি। মানুষ যারটা ইচ্ছা তারটা গ্রহন করবে।

৩) আরেক দিন জুম্মার খুতবায় বা ওয়াজে বলবেন যে,

জামাতের আমীর শফিকুর রহমান যখন খালেদ মহিউদ্দিনের "ইসলামে কিভাবে গণতন্ত্র আছে?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, "খলিফা ওমরের জামা দেখে কেউ একজন প্রশ্ন করে যে, আমাদেরকে দেয়া গনিমতের কাপড় দিয়ে জামা হল না আপনার হল কিভাবে? উত্তরে ওমর রাঃ বলেন যে, আমার ছেলের কাপড় আমাকে দিয়েছে তাই আমার এবং আমার ছেলের - উভয়ের কাপড় মিলিয়ে আমার জামা হয়েছে - এটা হল ইসলামের ভিতরে গণতন্ত্র"।

আজব ব্যাপার!!! এটা কি গণতন্ত্র !? এটা হচ্ছে জবাবদিহিতা। এইটুকু ব্যাপার যে বুঝে না - সে বলে যে, ইসলামে গণতন্ত্র আছে !!! হাদিসটি নিম্নরূপঃ

মুহাম্মাদ বিন ওবায়দুল্লাহ হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একদা দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)- এর নিকটে কিছু কাপড় আসলে তিনি সেগুলি হকদারগণের মাঝে বন্টন করে দেন। এতে আমাদের প্রত্যেকে একটি করে কাপড় পেল। কিন্তু তিনি নিজে দু'টি কাপড় দিয়ে তৈরী একটি পোষাক পরিধান করে খুৎবা দিতে মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর বললেন, হে লোকসকল! তোমরা কি আমার কথা শ্রবণ করছ না? এমতাবস্থায় বিখ্যাত সাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, জি না, আমরা শ্রবণ করব না। ওমর (রাঃ) বললেন, কেন হে আবু আব্দুল্লাহ? তিনি বললেন, আপনি আমাদেরকে একটি করে কাপড় দিয়েছেন। অথচ আপনি পরিধান করেছেন (দুই কাপড়ের) বড় পোষাক! ওমর (রাঃ) বললেন, ব্যস্ত হয়ো না হে আবু আব্দুল্লাহ! অতঃপর তিনি ছেলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) কে ডাকলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহর কসম করে জিজ্ঞেস করছি, আমার পোষাকে যে অতিরিক্ত কাপড় রয়েছে, সেটা কি তোমার নয়? আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বললেন, জি, এটি আমার। অতঃপর সালমান ফারেসী (রাঃ) বললেন, এখন আপনি বক্তব্য শুরু করুন, আমরা শ্রবণ করব (ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ২/১২৩; ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ১/২০৩)।

ইসলামে জবাবদিহিতা আছে। গণতন্ত্রে জবাদিহিতা আছে। কমিনিসমে জবাবদিহিতা আছে। সমাজতন্ত্রে জবাবদিহিতা আছে। ইহুদী ধর্মেও জবাবদিহিতা আছে। এখন জামাতের আমীর কি বলবেন যে, ইসলামে গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কমিনিসম, ইহুদী ধর্ম সব আছে ? তাহলে ইসলাম থাকল কোথায়? জামাতের আমীরের কাছে আমার প্রশ্ন।

এভাবে যারাই ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে আসবে, ইসলামের ভিতরে শিরক ঢুকাতে আসবে তাদের যুক্তি তর্ক খণ্ডন করে দিবেন।

৪) আরেক দিন ওয়াজে বা জুম্মার বয়ানে বলবেনঃ

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান" । (সূরা তাগহাবুনঃ১)

"......। হুকুম (বিধান বা আইন) দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই..........।" (সূরা ইউসুফঃ ৪০)

"..............আল্লাহ ছাড়া হুকুমদাতা বা আইনদাতা কেউ নেই, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি, যারা নির্ভর করতে চায়, তারা তাঁর উপর নির্ভর করুক।' (সূরা ইউসুফঃ ৬৭)

তারপর এই আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করবেন।

আইন দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ এই বিষয়ে আরও অনেক আয়াত কোরআনে আছে, অনেক হাদিস আছে। এভাবে কালিমার অর্থ মানুষকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিবেন নবীর (সাঃ) নির্দেশ মত যা তিনি মুয়াজ বিন জাবালকে রাঃ দিয়েছিলেন। যখন মুসল্লিরা গনতন্ত্রকে বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহকে আইনদাতা বলে স্বীকার করবে তখন তাদেরকে নামাজের দাওয়াত দিবেন। তার আগে নয়। এই শর্তই আল্লাহ এর রসূল সাঃ দিয়েছিলেন মুয়াজ বিন জাবালকে (রাঃ)।

কোরআন এবং আল্লাহ এর রসূলের সাঃ এর চেয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে এই ভূখণ্ডে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না। মুয়াজ বিন জাবালকে রাঃ দেয়া নবীর নির্দেশ এবং শর্ত না মানার কারণে এই ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। যে সকল লোক কালিমা গ্রহন করেনি অথচ তাদেরকে নামাজ, রোজা, হাজ্জের নিয়ম, পিতামাতার অধিকার, নারীর পর্দা, ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে ইসলামী বই প্রকাশকদের ও বুঝতে হবে যে, এই ভূখণ্ডের মুসলিমদের জন্য নামাজের বই, পর্দার নিয়মের বই প্রকাশ করে লাভ নেই। এদের জন্য কালিমার অর্থসহ বই প্রকাশ করতে হবে।

আনুগত্য পাবার মালিক একমাত্র আল্লাহ- এই সম্পর্কিত বই বের করতে হবে। যারা গাজওয়াতুল হিন্দ শুরু হবে এই আশায় বসে আছেন তাদের জন্যঃ

গাজওয়াতুল হিন্দ

আমার লেখা বই "মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ মাজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল" তে গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে বলা হয়েছে যে, অতি দ্রুত-ই হয়তো গাজওয়াতুল শুরু হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বহু আগেই গাজওয়াতুল হিন্দ শুরু হয়ে এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। ঐ বইটিতে আর হাত দিতে চাচ্ছি না - তাই এই বইয়ে লিখে দিলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুক্ত ক্রীতদাস সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন: একটি দল যারা ভারত জয় করবে এবং আরেকটি দল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে থাকবে।" (আন-নাসাঈ (নং ৩১৭৫) এবং ইমাম আহমদ আল-মুসনাদ (৩৭/৮১)

আল্লাহ এর রসূলের সাঃ সময়ে হিন্দুস্থান ছিল বর্তমানের বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্থান ও মায়ামারের রাখাইন অঞ্চল (৬২৫ সালের হিন্দুস্থান মানচিত্র দেখুন)। হিন্দুস্থান বলতে হিন্দুদের বুঝায় না। হিন্দুস্থান হচ্ছে একটি জায়গার নাম। হিন্দুস্থানের রাজাদের শিকল পড়ানোর অর্থ হচ্ছে এই অঞ্চলের রাজাদের শিকল পড়াবেন হিন্দুস্থানের যুদ্ধে বিজয়ী মুসলিমরা।

আমার মাঝে মাঝে মনে হত যে, আল্লাহ এর রসূল সাঃ আমাদেরকে নিয়ে কিছু বলে যান নি? আমাদের জন্য কোন দিক নির্দেশনা অর্থাৎ আমরা যারা নবীর সাঃ উম্মত উপমহাদেশে বসবাস করি তাদের জন্য কোন দিক নির্দেশনা। 'আলেমদের' কাছে শুধু এতটুকু জেনেছি যে, গাজওয়াতুল হিন্দ হবে উপমহাদেশে তবে তা হতে অনেক দেরি। আমরা জীবিত থাকতে হয়তো হবে না।

উমাইয়া খলিফা আবদ আল মালিক ইবনে মারওয়ান ৬৯২ সালে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে দায়িত্ব দেয় আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে রাঃ দমন করতে। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৬ মাস বোমা হামলা করেন এবং শেষ পর্যন্ত ৬৯২ সালে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে রাঃ হত্যা করেন।

আবু নওফাল বর্ণনা করেছেন: আমি আবদুল্লাহ (আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের) মৃতদেহ দেখেছি। মদিনার রাস্তায় (মক্কার দিকে) ঝুলন্ত যুবায়ের। কুরাইশরা এর পাশ দিয়ে চলে গেল এবং অন্যান্য লোকেরাও, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) এর (মৃত দেহের) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন: আবু খুবাইব (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের কুনিয়া) তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আবু খুবাইব তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আবু খুবাইব! আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে এ থেকে নিষেধ করতাম; আল্লাহর কসম, আমি তোমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করতাম, আল্লাহর শপথ আমি তোমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করতাম। আল্লাহর কসম, আমি যতদূর জানি, আপনি রোজা ও নামাযের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং রক্তের বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য আপনি খুব যত্নশীল ছিলেন। আল্লাহর কসম, আপনি যে দলটির অন্তর্ভুক্ত (তাকে) দুষ্ট (লেবেলযুক্ত) (করা হলেও) প্রকৃতপক্ষে এটি উত্তম দল। এরপর আবদুল্লাহ বিন উমর রাঃ চলে গেলেন। আবদুল্লাহ (বিন ওমর) (আবদুল্লাহ বিন জুবায়েরের মৃতদেহের সাথে) অমানবিক আচরণের ব্যাপারে যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং তার (সেই) কথা হাজ্জাজ (বিন ইউসুফ) এর কাছে পৌঁছেছিল এবং (এর ফলস্বরূপ) তাকে (আব্দুল্লাহ বিন জুবায়েরের দেহ) বাঁশ (বা গাছের কাণ্ড) থেকে নামিয়ে আনা হয়েছিল এবং মৃতদেহকে ইহুদীদের কবরস্থানে ফেলে দেয়া হয়েছিল। তিনি (হাজ্জাজ) আসমা'র (বিনতে আবু বকর, 'আবদুল্লাহর মা) কাছে (দূত) পাঠালেন। কিন্তু তিনি (আসমা বিনতে আবু বকর) আসতে অস্বীকার করেন। তিনি (হাজ্জাজ) আবার তার (আসমা বিনতে আবু বকরের) কাছে বার্তাবাহককে এই বার্তা দিয়ে পাঠালেন যে তাকে অবশ্যই আসতে হবে, অন্যথায় সে (হাজ্জাজ) তাকে (আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ) জোর করে তার চুল ধরে নিয়ে আসবে। কিন্তু তিনি (আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ) আবার প্রত্যাখ্যান করে বললেনঃ আল্লাহর কসম, আমি আপনার কাছে আসব না যতক্ষণ না আপনি (হাজ্জাজ) আমার কাছে এমন একজনকে পাঠাবেন যে আমার চুল ধরে টেনে টেনে নিয়ে যাবে। তখন তিনি (হাজ্জাজ) বললেনঃ আমার জুতা নিয়ে এসো। সে তার জুতা পড়ল এবং দম্ভ ও অহংকারে ফুলে দ্রুত হাঁটতে লাগল, যতক্ষণ না সে (হাজ্জাজ) তার (আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ) কাছে এসে বলল: আমি আল্লাহর শত্রুর (আবুদল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাঃ) সাথে যা করেছি তা আপনি কীভাবে দেখেন? তিনি (আসমা ইবনে আবু বকর (রাঃ)) বললেনঃ আমি দেখতে পাচ্ছি যে - তুমি (হাজ্জাজ) দুনিয়াতে তার (আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের রাঃ) প্রতি অন্যায় করেছ, অথচ সে তোমার পরকাল নষ্ট করে দিয়েছে। আমাকে জানানো হয়েছে যে, তুমি (হাজ্জাজ) তাকে (আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের) দুই বেল্টওয়ালা একজনের ছেলে বলে ডাকতে। আল্লাহর কসম, আমি আসলেই দুই বেল্টের (একজন মহিলা)। একটি

হল যেটির সাহায্যে আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবু বকর (রাঃ)-এর খাদ্যকে উঁচু করে রাখতাম যাতে তা পশুদের (নাগালের বাইরে থাকে) এবং দ্বিতীয় বেল্টের কথা হল, এটি এমন একটি বেল্ট যা কোন মহিলা বাদ দিতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের বলেছেন যে, সাকিফের মধ্যে একজন ভয়াবহ মিথ্যাবাদী এবং ভয়াবহ হত্যাকারীর জন্ম হবে। আমরা মিথ্যাবাদীকে দেখেছি, এবং খুনির সম্পর্কে, আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে পাই না। তখন তিনি (হাজ্জাজ) উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে (আসমা বিনতে আবু বকরকে রাঃ) কোন জবাব দিলেন না।(সহীহ মুসলিম ২৫৪৫)

* আসমা বিনতে আবু বকর হচ্ছেন আবু বকর রাঃ এর সেই কন্যা যিনি হিজরতের সময় নবী সাঃ এবং আবু বকরের রাঃ জন্য বকরি চড়িয়ে নিয়ে যেতেন যাতে নবী এবং আবু বকর বকরির দুধ পান করতে পারেন। আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাঃ হচ্ছেন আসমা বিনতে আবু বকরের রাঃ ছেলে।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রকৃত পরিচয় কি তা আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) আমাদেরকে বলে দিয়েছেন --- ভয়াবহ হত্যাকারী।

মুহাম্মাদ বিন কাশিম ৭১১-৭১২ সালের দিকে প্রথম ভারত আক্রমণ করেন এবং সিন্ধু বিজয় করেন। উপমহাদেশের মুসলিমরা এটাকে ভারতে মুসলিমদের প্রথম অভিযান বলে ধরে নেয়। এই অভিযান সফল হয়েছিল। সিন্ধি (হিন্দু) ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরকে মুহাম্মাদ বিন কাশিম পরাজিত করেন এবং দাহিরের কাঁটা মাথা বসরায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পাঠান। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে - কেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কথা গাজওয়াতুল হিন্দের অধ্যায়ে আমি আলোচনা করলাম। আল্লাহ এর রসূলের সাঃ হাদিস মোতাবেক এটি সেই দলের ভারত অভিযান নয় যেই দলের কথা মুহাম্মাদ সাঃ উনার হাদিসে বলেছেন। হাদিসে বলা আছে যে -

বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদ থেকে, তিনি সফওয়ান থেকে, তিনি জনৈক শায়খ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন; আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিন্দুস্তানের যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অবশ্যই তোমাদের একটি দল হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তাঁদের বিজয় দান করবেন। **তাঁরা হিন্দুস্তানের রাজাদের শিকল দিয়ে বেঁধে টেনে আনবে।** আল্লাহ তাআলা সেই মুজাহিদদের সকলকে ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর মুসলিমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে আঃ শামে পেয়ে যাবে।' আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, 'আমি যদি গাজওয়াতুল হিন্দের সময় বেঁচে থাকি, তাহলে আমার সমস্ত সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে দেব এবং

সেই যুদ্ধে শরীক হব। এরপর যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিজয় দান করবেন এবং আমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসব, তখন আমি হব (জাহান্নামের আগুন হতে) মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরাইরা, যে শামে গিয়ে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে মিলিত হবে।' (আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি তখন নবীজীকে বলেছিলাম,) 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার খুব আকাংখা যে, আমি ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে সংবাদ দেব যে, আমি আপনার সংশ্রবপ্রাপ্ত একজন সাহাবী।' তিনি বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন এবং বললেন, সে (যুদ্ধ) তো অনেক দেরি! অনেক দেরি!" (-আলফিতান, নুআইম ইবনে হাম্মাদ ১/৪০৯, হাদীস ১২৩৬)

মুহাম্মাদ বিন কাশিম সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নন যেই দলের কথা আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, "অবশ্যই তোমাদের একটি দল হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে"। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে যার সুসম্পর্ক তার ঐ দলে থাকার কোন সুযোগ নাই যার কথা আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন। আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছেন যে, "আল্লাহ তাঁদের বিজয় দান করবেন। **তাঁরা হিন্দুস্তানের রাজাদের শিকল দিয়ে বেঁধে টেনে আনবে"।** ইতিহাস থেকে আমরা দেখত পেলাম যে, মুহাম্মাদ বিন কাশিম হিন্দু রাজা দাহিরকে শিকল দিয়ে বেঁধে টেনে আনেন নি বরং তিনি নৃশংসভাবে তার কাঁটা মাথা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট পাঠান। তাহলে মুহাম্মাদ বিন কাশিম সেই লোক নন যার বা যাদের কথা মুহাম্মাদ সাঃ হাদিসে বলেছেন।

তাহলে সেই দল কারা যারা ভারত বিজয় করবে? গজনীর সুলতান মাহমুদ হচ্ছেন সেই দলের লোক যারা ভারত অভিযান করে - বিজয়ী হয়ে - হিন্দু রাজাদের শিকল দিয়ে বেঁধে টেনে এনেছিলেন।

তুর্কি ক্রীতদাস যোদ্ধা সাবিক্তিগিনের ছেলে হচ্ছেন গজনীর সুলতান মাহমুদ। ১০০১ সালে পেশোয়ারের (পেশোয়ার, পাকিস্থান) যুদ্ধে হিন্দু রাজা জয়পালাকে গজনীর সুলতান মাহমুদ পরাজিত করেন। এটি ছিল গজনীর সুলতান মাহমুদের প্রথম ভারতে বড় ধরণের অভিযান। এতে প্রায় ১ লাখ সৈন্য নিয়েও জয়পালা হেরে যান।

ইতিহাসবিদ স্যার এইচএম ইলিয়ট (Sir HM Elliot) যিনি ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানির সাথে কাজ করেছেন তিনি লিখেছেন, জয়পালাকে বাঁধা হয় এবং প্যারেড করানো হয় এবং তার পরিবারের সদস্যদের মুক্তির জন্য বড় মুক্তিপণ আদায় করা হয়। জয়পালা পরাজয়ে বড় অপমান বোধ করেছিলেন, এবং পরে

তিনি নিজের জন্য একটি চিতা তৈরি করেছিলেন এবং এটি জ্বালিয়ে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিলেন (অর্থাৎ আত্মহত্যা করেছিলেন)।

গজনীর সুলতান মাহমুদ- ই হচ্ছেন সেই দলের – প্রথম - লোক যাদের কথা আল্লাহ এর রসূল সাঃ বলেছিলেন উক্ত হাদিসে। তারপর উপমহাদেশে মুসলিমরা কতবার সফলতার সাথে অভিযান পরিচালনা করেছে তা আপনারা জানেন। আমরা যেমন নবীর সাঃ উম্মত তেমনি উনারাও নবীর সাঃ উম্মত ছিলেন। সুতরাং, গাজওয়াতুল হিন্দ বহু আগেই শুরু হয়েছে। ভারত অভিযান হয়েছে এবং আল্লাহ তাদের বিজয় দিয়েছেন এবং তারা ভারতের রাজাদের শিকল ও পরিয়েছিল। হাদিসটি খুব ভালোভাবে খেয়াল করুন, "তাঁরা হিন্দুস্তানের রাজাদের শিকল দিয়ে বেঁধে টেনে আনবে। আল্লাহ তাআলা সেই মুজাহিদদের সকলকে ক্ষমা করে দেবেন। অতঃপর মুসলিমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে (আঃ) শামে পেয়ে যাবে।"

এই হাদিসে আসলে, গাজওয়াতুল হিন্দ কত দিন চলবে তার একটি সময়সীমা আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) এই অঞ্চলের মুসলিমদের বলে গেছেন। ১০০১ সালে গজনীর সুলতান মাহমুদ পাকিস্থানের পেশোয়ারে ভারত অভিযান শুরু করেছিলেন, তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। তারপর অনেক মুসলিম যোদ্ধা ভারত অভিযান করেছেন এবং সফল হয়েছেন। যেমনঃ মুহাম্মাদ ঘড়ি, সায়্যিদ রাজবংশ, মামলুক রাজবংশ, লোদী রাজবংশ, দুররানি রাজবংশ; বাংলা অঞ্চলে খলজি রাজবংশ, কররানি রাজবংশ, ইলিয়াস শাহী রাজবংশ,ইত্যাদি। ১৫২৬ সালে লোদীরা মুঘলদের কাছে হেরে গেলে এই অঞ্চলে দাজ্জালের শাসন শুরু হয়, তারপর আসে মুঘলদের চেয়েও জঘন্য ইংরেজ শাসন তারপর পাকিস্থান তারপর বাংলাদেশ। ২০২৫ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে দাজ্জালের শাসন চলছে। এদিকে ভারত কাশ্মিরে মুসলিমদের ছাদবিহীন বন্দীশালায় বন্দি করে রেখেছে অন্যদিকে রাখাইনের মুসলিমদের মায়ানমারের সরকার গণহত্যা, নির্যাতন করে তাদের জন্মভূমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছে। আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) (-আলফিতান, নুআইম ইবনে হাম্মাদ ১/৪০৯, হাদীস ১২৩৬) হাদিস অনুসারে, ভারতে যারাই জন্মগ্রহন করবে তারা একটি যুদ্ধক্ষেত্রে জন্ম গ্রহন করেছে কারণ তাদের পূর্ব পুরুষরা ভারতে এসেছিল ভারতে অভিযান পরিচালনা করে ভারত বিজয় করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে। সুতরাং, আপনি এমন একজন মুসলিম যার পূর্ব পুরুষ ১৫২৬ সালে মুঘলদের কাছে পানিপথের যুদ্ধে হেরে গেছে, তারপর আপনার পূর্ব পুরুষকে ইংরেজরা শাসন করেছে তখনও আপনার পূর্ব পুরুষরা পরাজিত-ই ছিল, তারপর আপনার পূর্ব পুরুষ মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র করলেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা না করে প্রতিষ্ঠা করল গণতন্ত্র তারপর আপনার

পূর্বপুরুষ দাজ্জাল পাকিস্থান থেকে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেলেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা পেল না, প্রতিষ্ঠা পেল দাজ্জালের গনতন্ত্র। আপনি-আমি বর্তমানে একজন পরাজিত মুসলিম। আর যে পরাজিত হয় তাকে হয় বন্দি শিবিরে থাকতে হয় অথবা শরণার্থী শিবিরে। সে বিজয়ী দলের মতাদর্শের বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সে তার ধর্ম প্রচার করতে পারে না। তার কোন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে না। যেমনঃ বর্তমান কেউ যদি গনতন্ত্রকে অস্বীকার করে ইসলামী শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠার কথা বলে তাহলে তাকে গ্রেফতার করে বিভিন্ন মামলা দেয়া হয়। রাখাইনের মুসলিম রোহিঙ্গারা পরাজিত হয়েছে তাই তাদেরকে শরণার্থী শিবিরে থাকতে হচ্ছে। আর আমরা পরাজিত হয়েছি বহু আগেই – সেই ১৫২৬ সালে। এখন আমাদের অবস্থা কি?

আমাদের দেশের তথাকথিত "আলেম, মুফতি, মুহাদ্দিসরা" কাশ্মির, প্যালেস্টাইনের মুসলিমের নিয়ে কান্নাকাটি দেখায়, মায়াকান্না করে, সভা করে, লং মার্চ করে, পণ্য বয়কট করে অথচ মুসলিম রোহিঙ্গা - যারা আমাদের বাড়ির পাশে তাদের নিয়ে এই সব "আলেমদের" কোন কথা নেই। যখন রোহিঙ্গারা নির্যাতিত হয়ে আমাদের কাছে আসল আমরা তাদের ছাদবিহীন খোলা কারাগারে বন্দি করে রাখলাম যার নাম হচ্ছে শরণার্থী শিবির। যখন মুহাম্মাদ সাঃ সাহাবীদের নিয়ে মক্কা ছেড়ে মদিনায় গিয়েছিলেন তখন মদিনার মুসলিমরা কি মুহাম্মাদ সাঃ এবং সাহাবীদের শরণার্থী শিবিরে বন্দি করে রেখেছিলেন? এমন কি মদিনায় হিজরতের পূর্বে, মক্কার কাফিরদের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে, কিছু মুসলিম মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। সেখানকার খ্রিষ্টান রাজা কি সেই সকল মুসলিমদের সাথে এমন আচরণ করেছিলেন যা আমরা আজকে মুসলিম রোহিঙ্গাদের সাথে করছি ? বাংলার একজন আলেমকেও শুনলাম না বাংলাদেশ সরকারকে এই কথাটা বলতে যে, “হয় রোহিঙ্গাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে অস্ত্র দিয়ে রাখাইনে ফেরত পাঠাও যাতে তারা লড়াই করে নিজেদের জন্মভূমিতে বসবাস করতে পারে অথবা মুসলিম রোহিঙ্গাদের আমাদের সাথে ভাইয়ের মত মিলে মিশে থাকার অনুমতি দাও। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশের উচিত মিয়ানমারের সরকারকে বলা যে হয় তোমরা মুসলিম রোহিঙ্গাদের শান্তিমত থাকতে দাও নতুবা আমরা লড়াই করে রাখাইনকে আমাদের ভূখণ্ডের অংশ বানিয়ে নিবো যাতে মুসলিম রোহিঙ্গারা শান্তিতে থাকতে পারে।

মুসলিম রোহিঙ্গাদের সামান্য ইতিহাসঃ জমিদার গনেশার ছেলে বাংলা সালতানাতের শাসক জালালউদ্দিন হুসেইন শাহ প্রথম আরাকান (রাখাইন) অঞ্চল বিজয় করেন ১৪১৮-১৪৩১ সালের মধ্যে। তারপর ১৫১২ থেকে ১৫১৬ সাল পর্যন্ত বাংলা সালতানাতের সাথে আরাকান রাজ্যের (Bengal–Mrauk

U War (1512–1516)) যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বাংলা সালতানাতের জয় হলে আরাকান অঞ্চল বাংলা সালতানাতের Vassal state এ পরিণত হয়। এখন বুঝা যাচ্ছে, কিভাবে মায়ানমারের শুধু রাখাইন অঞ্চলে এত মুসলিম আসল। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন ঘটনায় রাখাইন অঞ্চল বার্মার অংশ হয়ে যায়।

১৯৪৬ সালের মে মাসে আরাকান অঞ্চলের মুসলিম নেতারা মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহের সাথে দেখা করেন। তারা জিন্নাহকে অনুরোধ করেন যে, জিন্নাহ যেন মায়ু অংশের দুইটি শহরকে পূর্ব পাকিস্থানের অংশ করেন। একটি শহরের নাম বর্তমান রাখাইনের Buthidaung Township অন্যটি বর্তমান রাখাইনের Maungdaw Township। এই দুটি শহর বা এলাকাতেই মুসলিম রোহিঙ্গারা বসবাস করত। ২মাস পরে আরাকানের মুসলিমরা নর্থ আরাকান মুসলিম লীগ গঠন করেন এবং জিন্নাহকে অনুরোধ করেন জিন্নাহ যাতে আরাকান অঞ্চলকে পূর্ব পাকিস্থানের অংশ হিসেবে নিয়ে নেন। কিন্তু জিন্নাহ বলেন যে, বার্মার (মায়ানমারের) অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জিন্নাহ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। তখন আরাকানের মুসলিমরা বার্মার সরকারকে বলে যে, বার্মার সরকার যেন ঐ দুটি শহরকে নবগঠিত পূর্ব পাকিস্থানের অংশ করার অনুমতি দেয় কিন্তু বার্মার সরকার তাতে রাজি না হওয়ায় ৫ হাজার যোদ্ধার একটি মুজাহিদীন দল মির কাসেমের নেতৃত্বে বার্মার সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে কিন্তু তারা হেরে যায়। তারপর থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত রাখাইনের মুসলিমরা বার্মা বা মায়ানমারের বৌদ্ধ সরকার দ্বারা প্রতি নিয়ত বৈষম্য, নির্যাতন, হত্যার শিকার হচ্ছে। Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), Arakan Rohingya Army (ARA), and Rohingya Islami Mahaz রাখাইন অঞ্চলের রোহিঙ্গাদের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে। আরাকান আর্মি (AA) নামে নতুন একটি গ্রুপের উত্থান হয়েছে যারা মায়ানমার সরকারের থেকে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে। ARSA এবং মায়ানমার সেনাবাহিনী একত্রে আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আরাকান আর্মি মুলত বৌদ্ধদের একটি সশস্ত্র আন্দোলন যারা আরাকান অঞ্চলে একটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র করতে চায়। এদিকে মুসলিম রোহিঙ্গারা শুধু রাখাইন অঞ্চলে শান্তিতে বসবাস করতে চায়।

ভারতবর্ষে বসবাসকারী প্রতিটি মুসলিমের বুঝা উচিত যে, গাজওয়াতুল হিন্দ তার জন্মের বহু আগেই শুরু হয়েছে এবং এখন সে যদি ভারত বিজয়ের কাজে সেই দলের সাথে যুক্ত না হয় যেই দল ভারত বিজয়ে আরও ১০০০ বছর আগেই এসেছিল তাহলে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না। কারণঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুক্ত দাস সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ জাহান্নামের

আগুন থেকে রক্ষা করবেন: একটি দল যারা ভারতবর্ষ জয় করবে এবং আরেকটি দল যারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে থাকবে।" (আল-মুসনাদ (৩৭/৮১) -এ; আন-নাসাঈ ৩১৭৫ এবং ইমাম আহমদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত)

অর্থাৎ ইসা আঃ আসার আগ পর্যন্ত ভারত অঞ্চলে যে সকল মুসলিম থাকবে তাদের কাজ হচ্ছে ভারত বিজয় করা। আপনি যদি ভারত বিজয়ে যারা এসেছিল তাদের দলে যোগ দিতে না পারেন তাহলে আপনার জান্নাতে যাবার সুযোগ কোথায়? কারণ আল্লাহ তো মাত্র ২ টি দলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন একটি দল হচ্ছে ভারত বিজয়কারী দল অপরটি হচ্ছে যারা ইসা আঃ এর সাথে থাকবে।

এখন জামাতে ইসলামী, চরমোনাই পীর, মামুনুল হক, ইত্যাদি এসে বলবে, এই যে দেখো আমরা ভারত বিজয়ে কাজ করছি গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করার মাধ্যমে। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, শায়েখ আহমদুল্লাহ, জাকারিয়া, মুজাফফর বিন মহসিন বলবেন যে, আমরা ডানে - বায়ে কোন দিকে নাই; আমরা সৌদি আরবের রাজপরিবারের গোলামিতে ব্যস্ত আছি। কোরাবানি ঈদে গরীব মানুষকে গরু কিনে দেই, মুসলিম যুবকদের কাজ শিখিয়ে চাকরী দেই, বন্যা হলে ত্রান দেই --- এভাবে আমরা ভারত বিজয়ের কাজ করছি। এদের কথা শুনলে হাসিনার কাজের বুয়া-ও হাসবে।

বর্তমান বাংলা অঞ্চলের মুসলিমরা গণহারে জাহান্নামে যাবে অনেক কারণে তবে এই সকল কারনের মধ্যে এটাও একটি কারণ যে - তারা মুসলিম রোহিঙ্গাদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করেনি বরং জুলুম করেছে।

যেহেতু ভারতবর্ষে দাজ্জাল আবির্ভূত হয়ে গেছে অর্থাৎ বাংলাদেশ এবং পাকিস্থানে দাজ্জালের শাসন চলছে সেহেতু এখন আমাদেরকে নবীর সাঃ দাজ্জাল আবির্ভূত হবার পরে করনীয় সম্পর্কিত হাদিস অনুসরণ করতে হবে। হাদিসটি হচ্ছে যুবকের ঘটনা সম্পর্কিত হাদিস যে যুবক দাজ্জালের পরিচয় মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল ফলে দাজ্জালের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ ইসলাম সঠিকভাবে প্রচারের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) কে আল্লাহ এর রসূল (সাঃ) যে শর্ত ও নির্দেশনা দিয়েছিলেন ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় সেই শর্ত এবং নির্দেশনা মানতে হবে।

মুঘল শাসন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত উপমহাদেশে দাজ্জালের শাসন-ই চলছে। অর্থাৎ উল্লেখ করার মত ভালো কিছুই এই অঞ্চলের মুসলিমদের দ্বারা হয়নি যা হাদিসের সাথে মিলে যায়।

আমরা বাস্তবে তাই দেখতে পাচ্ছি। লোদী রাজবংশের পতনের পর দিনের পর দিন এই ভারত অঞ্চলের মুসলিমদের ঈমান, আকিদা শুধু কমেছেই আর এখন তো শোচনীয় অবস্থা। ভারত অঞ্চলে মুসলিমরা এখন দাজ্জাল দ্বারা আক্রান্ত এবং পরাজিত অবস্থায় আছে। যেমনঃ কাশ্মীরে মুসলিমরা খোলা কারাগারে বন্দি আছে, নিয়মিত নির্যাতনের শিকার হচ্ছে; রাখাইন অঞ্চলের মুসলিমরা নির্যাতিত হয়ে বাংলা অঞ্চলের মুসলিমদের কাছে আশ্রয় চাইলে তাদেরকে শরণার্থী শিবিরের নামে খোলা বন্দি শিবিরে বাংলা অঞ্চলের মুসলিমরা বন্দি করে রেখেছে। দাজ্জালের অনুসারী আলেম ওলামারা গণতান্ত্রিক নির্বাচন করছে এমপি হবার জন্য অথচ তারা কখনো দাবী তুলেনি যে মুসলিম রোহিঙ্গারা আমাদের ভাই - তাদেরকে এই বাংলা ভূখণ্ডে আমাদের মতই থাকতে দিতে হবে। কোন মুসলিম গনতন্ত্রকে শিরক বলে প্রত্যাখ্যান করলে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়া হচ্ছে। বেশিরভাগ আলেম, ইমাম দাজ্জাল সরকারের পক্ষ নিয়ে নির্বাচন করছে আর যে সকল মুসলিম গণতন্ত্রকে অস্বীকার করছে তাদেরকে গোমরাহ বলে ফতোয়া দিচ্ছে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে ১৫২৬ সাল থেকে আলেম, ওলামাসহ ভারতের মুসলিমদের মধ্যে উল্লেখ করার মত ভালো কিছু হয়নি। হলে তা হাদিসে উল্লেখ করা থাকত।

নবী সাঃ কিন্তু বলেন নি যে, যারা ভারত বিজয় করবে তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে যখন শাম বিজয় করবে তখন ইসাঃ আসবেন। নবী (সাঃ) বলেছেন যে, যখন তারা শামে পৌঁছে যাবে তখন তারা সেখানে ইসা (আঃ) কে পেয়ে যাবে। সুতরাং, ইসা আঃ আসার আর বেশি দিন বাকি নেই। আমার অন্য বই "মুক্তিপ্রাপ্ত ইয়াজুজ এবং আবির্ভূত দাজ্জাল" যারা পড়েছেন তারা জানেন যে, দু'টি আলাদা আলাদা হাদিস ব্যাখ্যা করে আমরা দেখেছিলাম যে, ইসা আঃ এখন যে কোন দিন চলে আসবেন, এখন আরও একটি হাদিস বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে দেখলাম যে, ইসা আঃ আসার আর বেশী দিন বাকি নেই।

যারা গাজওয়াতুল হিন্দের অপেক্ষায় আছেন তাদের জন্য সংবাদ হচ্ছে, গাজওয়াতুল হিন্দ শুরু হয়ে শেষ পর্যায়ে আছে সুতরাং গাজওয়াতুল হিন্দ আবার কিভাবে শুরু হবে? এখন আমরা দাজ্জালের মুখোমুখি হয়েছি যা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা।

আমি এই বইয়ে বঙ্গ অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার উপায় লিখেছি। যদি এর চেয়ে ভালো শান্তিপূর্ণ কোন উপায় আপনাদের জানা থাকে তবে সেভাবে চেষ্টা করুন অন্যথায় আমার দেয়া পদ্ধতিটা নিয়ে চিন্তা করতে পারেন।

লক্ষ্য উদ্দেশ্যহীনভাবে ওয়াজে, জুম্মার বয়ানে এক আলেম আরেক আলেমকে কাফির ফতোয়া দিলে, নামাজের নিয়ম, রোজার নিয়ম, পর্দার নিয়ম, স্বামীর খেদমতের কথা বললে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করা হয় না। ইসলাম প্রচার করা হয় না। মুয়াজ বিন জাবালকে (রাঃ) দেয়া আল্লাহ এর রসূলের (সাঃ) নির্দেশ এবং শর্ত মেনে ইসলাম প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার কাজ করুন।

আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত: নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দিলেন এবং বললেন, "যায়েদ (ইসলামের) পতাকাটি নিয়েছিলেন এবং শহীদ হয়েছেন, তারপর জাফর (ইসলামের) পতাকাটি নিয়েছিলেন এবং শহীদ হন, তারপর 'আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (ইসলামের) পতাকাটি নিয়েছিলেন এবং তিনিও শহীদ হন এবং তারপর খালিদ বিন আল ওয়ালিদ (ইসলামের) পতাকাটি নিয়েছিলেন যদিও তিনি সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন না এবং আল্লাহ তাকে বিজয়ী করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও যোগ করলেন, "তারা আমাদের সাথে থাকলে আমরা খুশী হব না।" আইয়ুব, একজন উপ-বর্ণনাকারী, যোগ করেছেন, "অথবা নবী, চোখের পানি ফেলে বললেন, 'তারা আমাদের সাথে থাকতে খুশি হবে না।'" (সহীহ আল-বুখারি ২৭৯৮)

সহীহ আল-বুখারি ২৭৯৮ হাদিসে খালিদ বিন ওয়ালিদকে (রাঃ) কেউ ইসলামের পতাকা কাঁধে তুলে নিতে বলেন নি। উনি নিজেই ইসলামের পতাকা কাঁধে তুলে নেন যদিও তিনি দেখেছেন যে উনার আগের তিনজন এই পতাকা কাঁধে নিয়ে নিহত (শহীদ) হয়েছেন। আজকে ইসলামের পতাকা উপমহাদেশের কোথাও উত্তোলিত নেই। আজকে কে ইসলামের পতাকা নিজের কাঁধে তুলে নিবে? আছে কি এমন কেউ?

আমি এই বইয়ে যা কিছু লিখেছি তাতে ভুল কিছু থাকলে তা আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে আর ভালো কিছু থাকলে তা আল্লাহ এর পক্ষ থেকে। আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।